হেমপ্রভা।

উপন্যাস।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত বিরচিত।

কলিকাতা।

১৪ নং কলেজ স্কোয়ার,

জি, সি, রায় এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০১ সাল।

মূল্য এক টাকা।

উৎসর্গ পত্র।

যিনি অতি বাল্যেই বৈধব্য হার গলে পরিয়া, পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য
পালনে, আদর্শ রমণী রূপে আট মাসের মাতৃহীন শিশু
আমাকে স্নেহ কোলে তুলিয়া লইলেন; স্বার্থ
সংসারে যাঁহার কোলে থাকিয়া, আমি
তাঁহার স্নেহময় পবিত্র হৃদয়ের নিঃস্বার্থ
স্নেহ ভোগ করিয়াছিলাম, আমার
এই প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ মোর
পরমারাধ্যা মদীশ্বরী
স্বর্গীয়া মনোমোহিণী
গুপ্তা জ্যেঠী মাতা
ঠাকুরাণীর
পবিত্র চরণারবিন্দে উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত।

নিবেদন।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, কাশিমবাজার নিবাসিনী অশেষ-গুণালঙ্কৃতা-রমণীকুল-গরিমা বিদ্যোৎসাহিনী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, এস্, আই, মহোদয়া এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন সময়ে আমাকে এককালীন বিংশতি মুদ্রা সাহায্য করিয়াছিলেন এবং মদীয় বন্ধুবর শ্রীযুত বাবু অতুল চন্দ্র রায় এল, এম্, এস্ মহাশয় অকৃত্রিম স্নেহ[illegible] হইয়া, এই পুস্তকখানা আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

কলিকাতা, শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন।

হেমপ্রভা প্রথমতঃ ফরমায় ফরমায় বাহির হয়। প্রথম সংস্করণে দুই সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়া, প্রায় দেড় বৎসরের মধ্যেই সমুদয় নিঃশেষিত হইয়া যায়। দীর্ঘ কাল বিদেশ ভ্রমণে নিযুক্ত থাকাতে এই পর্য্যন্ত আর ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার অনেক স্থান সংশোধিত হইয়াছে। ভরসা করি এই সংস্করণেও পাঠক বর্গ কর্ত্তৃক ইহা পূর্ব্বরূপ সমাদৃত হইবে।

গ্রন্থকার।

হেমপ্রভা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নির্জ্জন আবাস।

রজনী দ্বিপ্রহর, সমস্ত জগত নিস্তব্ধ, কুমুদিনী-বল্লভ আকাশের কোলে বসিয়া, কৌমুদী রাশি ছড়াইয়া, প্রফুল্ল বদনে হাসিতেছেন। কোথাও একটী সাড়া শব্দ শুনা যাইতেছে না; কেবল চঞ্চল নৈশ সমীরণ মৃদু হিল্লোলে খেলিতে খেলিতে, নাচিতে নাচিতে, কুসুমপুরের প্রকাণ্ড প্রান্তর পার্শ্বস্থ নিবিড় অরণ্যের বৃক্ষাবলীকে দোলাইয়া, সর্ সর্ শব্দে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। কাল বাদুড়ের সুন্দর শশী সন্দর্শনে লজ্জা বোধ হয়, সে আলোকে মুখ দেখাইবে না বলিয়া, আঁধার অটবী কোলে যাইয়া ঝুলিয়া পড়িল। পেঁচক ক্ষুদ্রাশয়, সে কাহাকে সুখী হইতে দেখিতে পারে না, জগতকে হাসিতে দেখিলে মনে বড় কষ্ট পায়; সে দুঃখে অরণ্য মধ্যে যাইয়া, কাঁদিতে বসিল। এই নিস্তব্ধ সময় পূর্ব্বোক্ত নিবিড় অরণ্যে একটী মন্দির মধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। মন্দিরটী অতি পুরাতন, প্রাচীন বটবৃক্ষ সমূহ বৃদ্ধ-স্বভাব-সুলভ-স্নেহ-পরবশ হইয়া, রক্ষা হেতু যেন উহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কথিত আছে—প্রায় দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে কোন সংসারত্যাগী মহাপুরুষ

তপস্যার উপযোগী মনে করিয়া, তৎকালীন রাজার সাহায্যে নির্জ্জন প্রদেশে এই মন্দির নির্ম্মাণ ও মন্দিরের অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। মন্দিরবাসী গ্রীষ্মপীড়িত—বায়ু সমাগমের জন্য মন্দিরের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছেন। আলো রেখা বিমুক্ত দ্বারপথে আসিয়া, বাহিরে পড়িয়াছে। মন্দির মধ্যে সামান্য শয্যার উপর প্রায় পঞ্চত্রিংশ বর্ষীয় একটী লোক শায়িত। চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা শয্যা পার্শ্বে বসিয়া, অঞ্চল দ্বারা পিতৃব্যকে ব্যজন করিতেছে। বালিকার সুন্দর মুখের পশ্চাৎ ভাগে বিপুল কৃষ্ণ কেশরাশি পৃষ্ঠ বাহিয়া, অযত্নে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিশালনয়নের কৃষ্ণতারা দুটী সরল কোমল দৃষ্টিতে পিতৃব্যের প্রতি বিন্যস্ত। রমণীয় আরক্ত ওষ্ঠাধরের ঈষৎ বিচ্ছেদ ও সম্মিলনে বোধ হইতেছিল—বালিকা পিতৃব্যের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। মন্দিরের অনতিদূরে এক বৃক্ষ অন্তরালে দাঁড়াইয়া, বিংশতি বর্ষীয় একটী যুবক অনন্যমনে তাহাই দেখিতে ছিলেন। যুবকের পরিধানে ক্ষত্রিয় পরিচ্ছদ, কটিতে কোষবদ্ধ অসি, বসনের সর্ব্বস্থানে রক্তচিহ্ন। তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি বালিকার সুগৌর সুগোল হস্তের পরিচালনা ও আলো বিভাষিত সুন্দর মুখের প্রতি রহিয়াছে। যুবক মনে মনে বলিলেন "ইহাঁরা কে? নির্জ্জন বাসে কেন অবস্থান করিতেছেন?" জানিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে এক ঘোর কৌতূহল উপস্থিত হইল। কৌতূহল পরবশ হইয়া, মন্দিরবাসীদের সম্মুখীন হইবার মানসে, বৃক্ষ অন্তরাল হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলেন। হঠাৎ গৃহ প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া, মন্দির পার্শ্বে আসিয়া, আবার সঙ্গোপনে দাঁড়াইলেন। মন্দির মধ্যে যে কথোপকথন হইতেছিল, তিনি এখন সমুদয় স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। অন্যের গোপন আলাপন শ্রবণ করা নিতান্ত নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য—যুবক তাহা বিশেষ রূপে জানিতেন। কিন্তু কি করিবেন?

বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে মন্দিরবাসীদের কথোপকথন শুনিতে হইয়াছিল।”
প্রৌঢ় বলিলেন “হেমপ্রভা, এখন আমরা কোথায় যাই? সমস্ত দেশ এখন শত্রুপূর্ণ, কোন্ সময় আমরাও তাহাদের চক্ষে পড়ি তাহা বলিতে পারি না।”

হেম। “আপনার শরীর নিতান্ত অসুস্থ, এই সময় কিরূপে পথ পর্য্যটন করিতে সক্ষম হইবেন?”

প্রৌঢ়। “আমি এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থবোধ করিতেছি। ক্ষত সমূহও প্রায় এক প্রকার শুকাইয়া উঠিয়াছে।” গুরুজী টোপী উরুতে হস্ত সংলগ্ন করিয়া বলিলেন “এই স্থানের ক্ষতটী শুকাইলেই সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করি।”

হেমপ্রভা একটু মৌনভাবে থাকিয়া বলিল “কাকা, আমরাই যেন পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলাম, কিন্তু বাবার যে, কি দশা ঘটিয়াছে তাহা জানি না।”

গুরু। হেমপ্রভা, যে অদ্বিতীয় বীর তান্তিয়া টোপী নিজের অসাধারণ বুদ্ধিবলে গোয়ালিয়রপতিকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন; যিনি শত শত শত্রু সেনা মধ্য হইতে একমাত্র তরবারি চালনা করিতে করিতে পলায়ন করিলেন; ইংরাজ সেনা সহজে তাঁহাকে ধরিতে পারিবে এরূপ চিন্তা করিও না। তিনি বীরাগ্রগণ্য ও অসাধারণ বুদ্ধিমান।

হেম। “কাকা, আপনিইত বলিয়াছেন, যিনি দেশে এই বিদ্রোহকাণ্ড ঘটাইলেন, সেই মহারাজ নানা সাহেব কানপুর হত্যাকাণ্ডের পরই বিটুর নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। ফিরিঙ্গীগণ এখন প্রতিশোধ ইচ্ছার বশবর্ত্তী। তাহারা এখন শত্রুপক্ষীয় যাহাকে সম্মুখে পাইবে তাহাকেই বধ করিবে। তাহা হইলে বাবা যে, উহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন তাহার ভরসা কি? এ দুর্ব্বিপাকে শ্রু,

খুড়ীমা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে হারাইয়াছি; বিধাতা বা পিতৃস্নেহ হইতেও আমাকে অচিরে বঞ্চিত করেন।" এই কথা বলিতে বলিতে হেমপ্রভার সুন্দর মুখ চক্ষুজলে আর্দ্র হইল। দৃঢ়হৃদয় গুরুজী, টোপীরও নির্ব্বাপিত স্ত্রী পুত্র শোক পুনরায় উথলিয়া উঠিল।

মন্দিরবাসীদের কথোপকথন শুনিয়া যুবক বুঝিলেন, উঁহারাও তাঁহার ন্যায় অবস্থায় পতিত। আর বাহিরে থাকা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া, মন্দির দ্বারে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। হেমপ্রভা যেমন দ্বারের দিকে চাহিল; অমনি যুবকের প্রতি তাহার চক্ষু পড়িবামাত্র শশব্যস্তে দাড়াইয়া উঠিয়া বলিল "কাকা, কে যেন রক্তাক্ত দেহে দ্বারে দাড়াইয়া আছে!" ক্ল্যান্তুর, পীড়িত, ক্ষুত্ত উরু গুরুজী আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না, অমনি উঠিয়া বসিলেন, হেমপ্রভাকে বলিলেন "হেমপ্রভা, শীঘ্র আমার অসি দাও, বোধ হয় শত্রু আমাদের অনুসরণ করিয়াছে।" ক্ষত্রিয় যোদ্ধা, পীড়িত ক্ষত্রিয়ের তেজ দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে তাঁহার প্রশংসা করিলেন; বলিলেন "মহাশয়! আমি শত্রু নহি, আপনার মিত্র পক্ষীয় ক্ষত্রিয় সন্তান। আপনি যে কারণে অরণ্য বাস আশ্রয় করিয়াছেন, আমিও সেই কারণেই আপনার আবাস দ্বারে উপস্থিত। আপনাদের গোপন আলাপন শুনিয়াই মিত্র বোধে এ আশ্রয়ে আসিয়াছি।"

গুরু। তুমি কে? কেনই বা এত রাত্রিতে এখানে আসিয়াছ?

যুব। আমি ইংরাজের—ধর্ম্মবিদ্বেষী ফিরিঙ্গীর শত্রু। আমার নাম ভূপেন্দ্রজিৎ সিংহ। অযোধ্যা আমার নিবাস, অযোধ্যা সমরকাণ্ডে আমার ক্ষুদ্র শক্তি একবারে অনিয়োজিত ছিল না; বিদ্রোহীগণ আমাকে তাহাদের একজন অভিনেতা মনোনীত করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিল। আপনি স্থির হউন, কাতর শরীরে বৃথা কষ্ট পাইবেন না।

সুখেই হউক দুঃখেই হউক সমান অবস্থাপন্ন লোকের সাক্ষাৎকার

মনুষ্য জীবনে এক পরম শান্তি। গুরুজী টোপী স্বীয় অবস্থায় পতিত ভূপেন্দ্রের পরিচয় পাইয়া মনে মনে নিতান্ত সুখী হইলেন। সহায়লাভ জ্ঞানে তাঁহার হৃদয় আরো অধিকতর পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি আগ্রহ সহকারে ভূপেন্দ্রকে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। যুবকও ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুরুজী টোপী তাঁহাকে বসিবার জন্য শয্যাপার্শ্ব দেখাইয়া দিলেন। ভূপেন্দ্র বিনীতভাবে আসন পরিগ্রহণপূর্ব্বক গুরুজীর সহিত যুদ্ধসংক্রান্ত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

বালিকা হেমপ্রভা অবনত মস্তকে প্রকোষ্ঠের এক কোণে বসিয়া যুবকের আলাপ শুনিতে লাগিল—আলাপ কি কণ্ঠস্বর তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। তাহার বড় বড় চক্ষু দুটী মৃত্তিকার পানেই রহিয়াছে; তবে যদি মাঝে মাঝে অজ্ঞাতসারে যুবকের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে, পাঠক, এই সরল বালিকাকে তাহা ক্ষমা করিবেন। ক্ষমা করুন আর নাই করুন, এই জন্য সত্বরই বালিকাকে ভারি বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। কি জানি কেমন করিয়া—সর্ব্বনাশ! কি জানি কেমন করিয়া, যুবকের দৃষ্টির সহিত একবার তাহার দৃষ্টি মিশিল, নয়নে নয়নে একবার মাত্র দেখা হইল। হেমপ্রভার ঈষন্নত মুখ একেবারে নত হইয়া পড়িল। যদি সেই সময় কেহ উঁকি মারিয়া, বালিকার মুখ দেখিতে পারিত, সে দেখিত হেমপ্রভার সুন্দর কপোলদ্বয়ের স্বাভাবিক রক্তিমাভা আরো গাঢ় হইয়াছে। চক্ষুদ্বয় লজ্জায় গলিয়া গিয়াছে। পরম সুন্দর মুখে লজ্জার ছায়া পড়িয়া, আরো মনোহর, আরো মধুর হইয়াছে। মৃত্তিকার পরম সৌভাগ্য—সে বসিয়া বসিয়া এই মনোহর দৃশ্য দেখিল, অন্য কেহ দেখিল না। লজ্জা তথা হইতে হেমপ্রভাকে প্রকোষ্ঠান্তরে তাড়াইয়া দিল।

কতক্ষণ আলাপের পরই গুরুজী টোপী আবার হেমপ্রভাকে ডাকি-লেন। অতি সঙ্কুচিতভাবে হেমপ্রভার হেমমূর্ত্তি আসিয়া আবার সেই প্রকোষ্ঠে ধীরে ধীরে উপস্থিত হইল। গুরুজী হেমপ্রভাকে ভূপেন্দ্রের আহারের আয়োজন করিয়া দিতে বলিলেন। বালিকা পিতৃব্যাদিষ্টা হইয়া, প্রকোষ্ঠান্তরে তাঁহার আহারের আয়োজন করিয়া দিল। ভূপেন্দ্র আহার করিতে বসিলেন। হেমপ্রভাও নিজের চয়িত যৎসামান্য আহারীয় তাঁহার ভোজন পাত্রে রাখিয়া, সলজ্জভাবে একটু দূরে দাঁড়া-ইল। ভূপেন্দ্রের ইচ্ছা একবার হেমপ্রভার সহিত আলাপ করেন—কিন্তু কি বলিয়া আলাপ করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে চিন্তা করিয়া, ধীরে ধীরে হেমপ্রভাকে বলিলেন "আমি এখানে আসাতে আপনাদিগকে আরো অধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হইল।"

হেমপ্রভা অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিল "আপনি কেন এরূপ মনে করিতেছেন?" বালিকার আরো কি জানি বলিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু বলিতে পারিল না, সলজ্জভাবে পূর্ব্ব স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

পাঠক! ভূপেন্দ্রের কি হেমপ্রভার সহিত আরো আলাপ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল না? তিনি মনে করিতেছিলেন হেমপ্রভার একটী কথা শুনিবার জন্য যেন সমগ্র পৃথিবী দান করিতে পারেন। আমাদের ভূপেন্দ্র ভদ্রসন্তান, বালিকার লজ্জা বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে অন্য কোন কথা বলিতে সাহস পাইলেন না; নীরবে বসিয়াই অন্যমনস্কে আহার সমাপন করিয়া উঠিলেন।

রাত্রি অধিক হইয়াছিল, মন্দিরবাসী প্রত্যেকেই নির্দ্দিষ্ট শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলেন। পথ পর্য্যটনে ভূপেন্দ্রের শরীর নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু নিদ্রা সুখ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। নিজের অবস্থা সম্বন্ধীয় নানা চিন্তা আসিয়া, তাঁহার মনে উদিত হইতে

লাগিল এবং থাকিয়া থাকিয়া বালিকা হেমপ্রভাও তাঁহার চিন্তাকুল চিত্তে খেলা করিতে লাগিল। অনেকে হয়ত আমাদিগকে এই বলিয়া দোষারোপ করিতে পারেন যে, আমরা কেন এরূপ চিত্র আঁকিলাম? ভূপেন্দ্রের এরূপ বিপন্নাবস্থা, কোথায় যাইবেন, কি করিবেন তাহার স্থিরতা নাই, তাহাতে আবার বালিকার চিন্তা কেন? কিন্তু আমরা কি করিব? তখন যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই কেবল লিখিতে পারি, ভূপেন্দ্রের চিত্তের প্রতি আমাদের কোন অধিকার নাই। এস্থলে পাঠিকাদিগকেও একটী কথা গোপনে বলি যে, বালিকা হেমপ্রভাও সেই রাত্রি স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারে নাই। তাহা আমরা বেশ জানি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব ঘটনা।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষের নানা স্থানে—বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে শিপাহীদিগের মধ্যে যে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল; যে প্রদীপ্ত হুতাশনে ভারতবর্ষস্থিত কত শত ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকা ভস্মসাৎ হইয়াছিল; যে অনল দাবানলের ন্যায় ভারতের ভাবী আশাকানন দগ্ধ করিয়া সুবিস্তীর্ণ ভারত বক্ষে ব্রিটিশবল অক্ষয় অনন্তরূপে সংস্থাপিত হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল; ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা সম্যক অবগত আছেন। বিদ্রোহ কাণ্ড বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা এ পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য নয়; তবে আখ্যা-

য়িকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত যে ঘটনার সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাই অতি সংক্ষেপে এখানে বিবৃত হইবে।

বিদ্রোহীদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচার কানপুর, মিরাট ও অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানেই ভয়ানক রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। কানপুরের লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের পর ইংরাজ-সেনাতরঙ্গ যখন উক্ত স্থানে সবেগে প্রবেশ করিল, বিদ্রোহ-অভিনেতা নানা সাহেব তাহার অনতি পূর্ব্বেই আসন্ন বিপদ ভাবিয়া, বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার লেপ্‌টেনেণ্ট বীরবর তান্তিয়া টোপী অন্যদিকে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহী সেনার সহিত যোগদান করিয়া গোয়ালিয়র পতি জিয়াজীরাও সিন্ধিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করেন। তান্তিয়া টোপীর গোয়ালিয়র অবস্থান কালীন তাঁহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন অনেকেই কানপুরের গোলযোগে নিধন প্রাপ্ত হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গুরুজী টোপী এক মাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া, পলায়ন করিলেন। অনেক দিন যাবৎ তাঁহারা কুসুমপুরের অরণ্য মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া আসিতেছেন, পাঠক, আপনার সহিত তাঁহাদের একবার সাক্ষাৎ হইয়াছে।

ব্রিটিশ বিক্রমের অনিবার্য্য উদ্যমেও নেপাল কেশরী জং বাহাদুরের অন্যায়রূপে ব্রিটিশপক্ষ গ্রহণে কানপুর ইত্যাদি স্থানের বিদ্রোহ বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু উঁহার জ্বলন্ত ক্রিয়া ক্রমে পূর্ব্বদিকে প্রসারিত হইয়া, অযোধ্যাকে আবার প্রচণ্ডবেগে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অযোধ্যাতে ইংরাজদিগের যে রেজিমেণ্ট ছিল তাহারাই প্রথমতঃ নবাবের পক্ষ হইয়া বিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিল। কমিশনর লরেন্স এই উপস্থিত বিপ্লব নিবারণ জন্য সমুচিত চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া, তাঁহাকে অচিরেই সমস্ত ইউরোপীয় সহ

আত্মরক্ষার্থে রেসিডেন্সির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। চতুর্দ্দিক হইতে নগরবাসীগণ দলেদলে আসিয়া, বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিতে লাগিল। তন্মধ্যে ভূপেন্দ্রজিৎ সিংহ নামক একজন যুবক ক্ষত্রিয় ভূস্বামী এই বিদ্রোহকাণ্ডে যোগদান করিয়া, নিজের অসাধারণ রণদক্ষতা ও প্রভূত অর্থ দ্বারা বিদ্রোহীগণকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। যদিও তিনি দেশোদ্ধার ও ধর্ম্মোদ্ধারেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়া, সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার বীরহস্ত স্ত্রীলোক কি বালকের প্রতি অত্যাচারে মুহূর্ত্তের জন্যও নিয়োজিত হয় নাই। বরং পাষণ্ড বিদ্রোহীদের নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে অনেক স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা রক্ষা করিয়া, তিনি নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ইতি মধ্যে কমিশনর লরেন্স একদিন রজনীযোগে রেসিডেন্সি মধ্যস্থ এক গৃহে বসিয়া চিন্তা-নিমগ্ন আছেন, হঠাৎ বিপক্ষ পক্ষ হইতে একটী গুলি আসিয়া তাঁহার শরীরে লাগিল; সেই আঘাতেই তিনি ভয়ানক রূপে আহত হইয়া রেসিডেন্সি মধ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। অন্যান্য শ্বেতাঙ্গেরা রেসিডেন্সির মধ্যে থাকিয়া, বিপক্ষ দলের অবিরাম অত্যাচার অহোরাত্র ভোগ করিতে লাগিল। তাহাদের উদ্ধার হেতু জেনারেল হ্যাবলক, মেজর আউট্রাম ও জেনারেল নিল সসৈন্যে আসিয়া লক্ষ্ণৌ পৌছিলেন। কিন্তু বিপক্ষ দলের প্রবল বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, উক্ত যোদ্ধাত্রয়কে ও পূর্ব্ব প্রদর্শিত রেসিডেন্সি-আশ্রয় পথই গ্রহণ করিতে হইল।

এ বার্ত্তা শ্রবণে কিছুদিন পরে সার্ কোলিন্ ক্যাম্বেল লক্ষ্ণৌতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও বিদ্রোহীগণের কোন শাস্তি বিধান করিতে পারিলেন না, কেবল বালক, স্ত্রীলোক ও আহত ব্যক্তিদিগকে

রেসিডেন্সী হইতে উদ্ধার করিয়া, কানপুরে লইয়া গেলেন। বিদ্রোহ কাণ্ডের কোন উপশম হইল না দেখিয়া, নানা স্থান হইতে ব্রিটিশ সৈন্য লক্ষ্ণৌতে প্রেরিত হইল। তাহাদের সহিত কতকদিন ঘোরতর যুদ্ধ হয়, ভূপেন্দ্রজিং সিংহ শেষ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। পলায়নের পরে তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, পাঠক মহাশয়েরা তাহাও অবগত আছেন।

অযোধ্যা পুনরধিকৃত হইল, নবাবকে রাজ্যচ্যুত করা হইল, তথাপি ইংরাজগণ বিদ্রোহীদের অত্যাচার বিস্মৃত হইলেন না। পলায়িত বিদ্রোহীদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

——:o:——

হৃদয় মিশিতে ছিল।

সূর্য্যদেব মধ্যগগণ বিহারে বিরক্ত হইয়া, অনেক পশ্চিমে সরিয়া পড়িয়াছেন। উদরসেবাপরায়ণ পক্ষীগণ এখনও নিজ নিজ উদর পূরণেই রত। সৌরকরের তীক্ষ্ণতা অনেক কমিয়াছে। কুসুমপুরের অরণ্যমধ্যস্থ পুষ্করিণীর তীরে বৃক্ষতলে বসিয়া একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা কি জানি কি ভাবিতেছিল। একটী রসিক কাক হাঁ করিয়া, বৃক্ষের আড়ালে বসিয়া, তাহাই দেখিতেছে। হেমপ্রভা নির্জ্জনে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছে, হয়ত তাহা জানিবার জন্য পাঠকবর্গের কৌতূহল

হইতে পারে। আপনাদের দুর্দ্দশা, পিতার অনিশ্চিতাবস্থা, কিম্বা ইহা ছাড়া অন্য কিছু, ইহার কোনটী হেমপ্রভার চিন্তার বিষয় ছিল, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ এ সমুদয় চিন্তাই বালিকার কোমল মনকে আলোড়িত করিতেছিল। বালিকা যখন চিন্তার তরঙ্গে আন্দোলিত, সে সময় ভূপেন্দ্র আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অন্যমনস্কা ছিল—বালিকা তাঁহার আগমন জানিতে পারে নাই। ভূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "হেমপ্রভা, এখানে একা বসিয়া কি করিতেছ?" হেমপ্রভার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল, সে একটু চকিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল, ভূপেন্দ্রকে নিকটে দেখিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। ভূপেন্দ্র অমনি বলিলেন "হেমপ্রভা, চলিয়া যাইতেছ যে?" বালিকা কি উত্তর করিবে? আকাশ পাতাল ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বলিল "হয়ত কাকা আমাকে খুঁজিতেছেন।"

ভূপে। "আমি এই মাত্র তাঁহার নিকট হইতে আসিলাম। তিনি এখনও নিদ্রা যাইতেছেন।" হেমপ্রভা গমনে বিরত হইল, ভূপেন্দ্র পুনরায় বলিলেন "হেমপ্রভা, আমি কয়েকটী কথা বলিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছি, তুমি শুনিবে না কি?" হেমপ্রভা কোন উত্তর করিল না, কেবল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ভূপেন্দ্র তাহার সম্মতি বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। উভয়ে এক বৃক্ষতলে যাইয়া উপবেশন করিলেন; যুবক বলিলেন "হেমপ্রভা, আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া, গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, তোমাদের সহবাসে এ স্বর্গ সুখ ভোগ করিব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাকে শীঘ্রই এসুখ ছাড়িয়া যাইতে হইল।"

হেম। আপনি কেন যাইবেন?

ভূপেন্দ্র। আমার আত্মীয় স্বজন কে কোথায় কি ভাবে আছেন,

কাহার কি হইয়াছে, তাহা জানি না। আমাকে আপাততঃ তাঁহাদের অনুসন্ধানেই বাহির হইতে হইবে। এ বিপ্লব সময় মনুষ্যোচিত কার্য্য না করিয়াই বা আর কত দিন নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিব? যেরূপ দেশের অবস্থা, ইহাতে পুনরায় তোমাদের সহিত যে, কবে দেখা হইবে, একেবারেই হইবে কি না বলিতে পারি না। হেমপ্রভা, তুমি কি আমাকে মনে রাখিবে?

হেমপ্রভার হৃদয় ব্যথিত হইল, সে কাতর স্বরে বলিল "আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলে আমাদের উপায়?"

ভূপেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন "হেমপ্রভা, তুমি কি মনে করিতেছ আমি সে চিন্তা করি নাই? আমার এখানে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিলে বিশেষ লাভ নাই; হয়ত চেষ্টা করিলে তোমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত কোন নিরাপদ স্থান পাইতে পারিব। এ আশাও আপাততঃ তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাওয়ার একটী প্রধান কারণ। এখন গুরুজী টোপী এক প্রকার আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি যেরূপ বীর এবং কৌশলী, তাহাতে হঠাৎ কোন বিপদে পড়িবেন এরূপ আশঙ্কা করি না। আমার কার্য্য সিদ্ধ হইলে আবার আসিয়া তোমাদের সহিত শীঘ্র দেখা করিব।"

হেম। যদি ইতিমধ্যেই আমরা ফিরিঙ্গীদের চক্ষে পড়ি, তাহা হইলে বুঝি আপনার সহিত আর দেখা হইবে না।" বালিকা মনে মনে ভাবিল "মনের সাধ বুঝি আর মিটিবে না" সে প্রথম দর্শনেই যাঁহাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, যে ভূপেন্দ্র ঘুণাক্ষরেও বালিকার মন এপর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই, সেই ভূপেন্দ্রকে হেমপ্রভা কেবল মাত্র কয়দিন দেখিয়াছে; তিনি চলিয়া যাইবেন, ইহা ভাবিয়া বালিকার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। এক এক বার তাহার মনে লইতেছিল ভূপেন্দ্রকে হৃদয়

খুলিয়া দেখায়, জিহ্বাও অনেক বার হৃদয়ের কথা বলিতে চাহিল, কিন্তু রমণী-সুলভ—বিশেষতঃ বালিকা-সুলভ লজ্জা আসিয়া তাহাকে বারণ করিল। হেমপ্রভা অন্য মনে পুষ্করিণীমধ্যস্থ একটী পদ্মের প্রতি চাহিয়া চিন্তা করিতেছিল; হঠাৎ তাহার মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে দুইটী শব্দ বাহির হইয়া পড়িল। হেমপ্রভা কি জানি কি ভাবিতে ভাবিতে বলিয়া উঠিল **"ভূপেন্দ্র তুমি"** এই দুটী শব্দ বলিবামাত্র বালিকার সুন্দর কপোল লজ্জা-রাগে একেবারে রঞ্জিত হইয়া গেল। কুকার্য্য করিয়াছে, ভূপেন্দ্রকে আর মুখ দেখাইতে পারিল না, নীরবে মৃত্তিকার পানে চাহিয়া রহিল।

পাঠক! যে প্রণয় সমীরণ সরল বালিকার কোমল হৃদয়কে দোলাইতেছিল, ভূপেন্দ্রের হৃদয়ও যে তাহাতে দুলিতেছিল ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যে দিন ভগ্নমন্দির মধ্যে দীপালোকে হেমপ্রভার মোহিনী মূর্ত্তি ভূপেন্দ্র প্রথম দেখিয়াছেন, সেই দিন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই ভূপেন্দ্র ঐ সরল স্বর্ণমূর্ত্তি হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার ধ্যান করিতেছিলেন। বালিকার মুখনিঃসৃত সামান্য ইঙ্গিতে তাঁহার মন বুঝিলেন, এখন সাহস পাইয়া চঞ্চলভাবে তাহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন "হেমপ্রভা, কি বলিতেছিলে, বলিতে বলিতে এ সুন্দর মুখখানি নত হইয়া পড়িল কেন?" যে স্পর্শ সুখ জগতের সমস্ত সুখরাশি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বালিকার মনে দৃঢ় বিশ্বাস, আজি সে করস্পর্শে হেমপ্রভার শরীর শিহরিয়া উঠিল, বাহ্য জগত ভুলিয়া গেল, হস্ত ভূপেন্দ্রের হস্তেই রহিল। প্রেম-তাড়িতোন্মত্ত যুবক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "হেমপ্রভা, চুপ করিয়া রহিলে যে?" কে যেন এসময় বালিকার কানে কানে বলিল "নির্ব্বুদ্ধি, এমন সময় আর কখন পাইবে? কেহ দেখিতেছে না, কেহ শুনিতেছে না, তবে কেন একবার প্রাণ ভরিয়া আলাপ

করিতেছ না?" বালিকা যেন আবারো শুনিতে পাইল, "যদি তুমি এখনও মুখফুটাইয়া আলাপ না কর, তবে ভূপেন্দ্র—তোমার হৃদয় রাজ্যের রাজা ভূপেন্দ্র মনে কষ্ট পাইবেন।" হেমপ্রভা কথা কহিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না, লজ্জাবনত মুখে পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিল।

কেহ কেহ বলিতে পারেন হঠাৎ এরূপে হেমপ্রভার হাত ধরাটা ভূপেন্দ্রের অন্যায় হইয়াছে। যে ভূপেন্দ্র এযাবৎ বালিকার মন ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই, একটী সামান্য কথায় তাঁহার এতদূর সাহস হওয়া অস্বাভাবিক। আমরা আপত্তিকারীকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার জীবনে কি এরূপ সময় কখনও ঘটে নাই, যখন তিনি কাহারো মুখ হইতে কোন অনুকূল উত্তরের জন্য লালায়িত হইয়া—হয়ত যে উত্তরের উপর তাঁহার সমস্ত সুখ দুঃখ নির্ভর করে—একটা সাধারণ কথা, এমন কি একটী সামান্য মুখভঙ্গীকে তাঁহার ইচ্ছার অনুকূল বলিয়া মনে করিয়াছেন? এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সময় সময় ভুল হইতে পারে, কিন্তু ভূপেন্দ্রের তাহা হয় নাই, তবে আর আপত্তি কি?

সেই সময়, যে সময় প্রণয়-বাত্যাতাড়িত দুইটী হৃদয় পরস্পর প্রত্যভিমুখে মিলিত হইতে আসিতেছিল; যে সময় উভয়ে উভয়ের নিকট বসিয়া স্বর্গকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছিলেন; সেই আগ্রহের সময় ভূপেন্দ্র হেমপ্রভা যেখানে বসিয়াছিলেন, তাহার অনতিদূরে সশস্ত্র কয়জন ইংরাজসেনা সহসা আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে উভয়েই চকিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, উভয়ের হৃদয়ের গতি উভয়ের হৃদয়ে ফিরিয়া গেল। বালিকার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, চক্ষু স্থির হইল, অমনি শশব্যস্তে ভূপেন্দ্রের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া, ভয় বিকম্পিত স্বরে বলিল "শত্রু উপস্থিত? এখন উপায়?" ভূপেন্দ্র বলিলেন "হেমপ্রভা, যাও, তুমি শীঘ্র দৌড়াইয়া পলায়ন কর, আমাকে অতিক্রম করিয়া কেহ তোমার

পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে পারিবে না; তোমার পিতৃব্যকে যাইয়া সম্বাদ দাও।” হেমপ্রভার চরণে গতিশক্তি ছিল কি না সন্দেহ, সে যাইতে পারিল না, কেবল নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

দেখতে দেখিতে দশজন ইংরাজ সেনা নিকটে আসিয়া পৌছিল; উহাদের মধ্যে চারিজন ফিরিঙ্গী ও অবশিষ্ট শিখ সেনা। সেনানায়কও শেষোক্ত শ্রেণীর বলিয়া বোধ হইতেছিল। এই বিদ্রোহ সময় পাতিয়ালার মহারাজা ইংরাজদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, উক্ত শিখগণ তাঁহারই প্রেরিত সেনা। শিখ সেনা দেখিলে ভূপেন্দ্র তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া ভাবিতেন না; কিন্তু সঙ্গে ফিরিঙ্গী সেনা দর্শনে শত্রু বলিয়াই স্থির করিলেন। নিরস্ত্র ভূপেন্দ্র এখন কি করিবেন? ক্ষত্রিয়-তেজ, ক্ষত্রিয় বীর্য্য হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল; অনন্যোপায় হইয়া সম্মুখস্থ বৃক্ষ হইতে একটী শাখা ভাঙ্গিয়া লইলেন। শত্রুদলনায়ক ভূপেন্দ্রের সাহস দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বলিলেম “তুমি এক্ষণে নিরস্ত্র, আত্মরক্ষা-আশা ত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণ কর; নতুবা এই অন্যায় সাহসের প্রতিফল স্বরূপ জীবন হারাইবে।” ভূপেন্দ্র গর্ব্বিত বাক্যে উত্তর করিলেন, “আমি জানিতাম না, ক্ষত্রিয় রক্ত যাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত যুদ্ধই যাঁহার পরম ধর্ম্ম, রণে ভঙ্গ দেওয়া যাঁহার মহাপাপ, সেই ক্ষত্রিয়ের মুখ বিনা যুদ্ধে অন্যকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিতে পারে। কিন্তু যখন তুমি ক্ষত্রিয় জন্ম ভুলিয়া, বিধর্ম্মী ফিরিঙ্গীর গোলামি অভ্যাস করিয়াছ, স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে রণক্ষেত্রে নামিয়াছ, তখন তোমার মুখ হইতে এই অক্ষত্রিয়োচিত বাক্য অবশ্য বাহির হইবে। কিন্তু ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার! আমি নিরস্ত্র, বৃক্ষ শাখাই আমার সহায়, তুমি যে ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অগ্রসর হইয়া দেখ সেই ক্ষত্রিয় বংশোৎপন্ন যুবক, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য আজি কি প্রকারে জীবন

সমর্পণ করে।" ভূপেন্দ্র হস্তস্থ বৃক্ষশাখা ও বাহু প্রদর্শন করিয়া বলি- লেন "আজি এ বাহুই এ বৃক্ষশাখাবলে তোমার স্বদেশ-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণরূপ মহাপাতকের দণ্ড বিধান করিবে; এস অনন্ত নরক তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।" ইংরাজ সেনানায়কের চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল, ক্রোধ কম্পিত স্বরে সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন, "দুরাত্মাকে এখনই সমুচিত প্রতিফল দাও।" তাহারা আদেশ প্রাপ্তমাত্র ভূপেন্দ্রের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া, তরবারি চালনা করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয় যুবক শত্রু মধ্যবর্ত্তী হইয়া, সিংহ শাবকের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগি- লেন। শীঘ্রই তাঁহার হস্তস্থ বৃক্ষশাখা শত্রুর অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। উন্মত্ত ভূপেন্দ্র তথাপি ক্ষত্রিয় তেজ ভুলিলেন না; বামহস্তে ছিন্নাবশিষ্ট বৃক্ষশাখা দ্বারাই শত্রুর অস্ত্রাঘাত সম্বরণ করিতে করিতে, নিকটস্থ ইংরাজ সেনা নায়ককে মুষ্টি প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। এমত সময় পশ্চাৎ দিক হইতে একজন ফিরিঙ্গী আসিয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া গুরুজী টোপী এই যুদ্ধ কোলাহল শুনিলেন। বিপদ আশঙ্কায় অমনি দ্রুতপদে দুইখানি তর- বারি হস্তে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভূপেন্দ্রকে বিপদাক্রান্ত দেখিয়া, সজোরে ফিরিঙ্গী সেনার হস্তে অস্ত্রাঘাত করিলেন। ফিরিঙ্গী অস্ত্রাঘাতে ব্যথিত হইয়া, ভূপেন্দ্রকে ছাড়িয়া দিল। ভূপেন্দ্র এখন সময় পাইয়া গুরুজীর হস্ত হইতে অস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং উভয়ে ঘোরতর বেগে বিপক্ষ দলকে আক্রমণ করিলেন। কতক্ষণ যুদ্ধের পর দুইজন ফিরিঙ্গী- সেনা ও একজন শিখ-সেনা নিহত হইল। ভূপেন্দ্র এবং গুরুজী টোপী বিপক্ষ অস্ত্রাঘাতে এত ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন যে আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, উভয়েই অচেতন হইয়া, ক্রমে ক্রমে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। হেমপ্রভা এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির দৃষ্টিতে এই কাণ্ড দেখিতে

ছিল, গুরুজী ও ভূপেন্দ্রকে পতিত দেখিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। অবশিষ্ট সেনাগণ কতক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিল। পরে অচেতনাবস্থ গুরুজী, ভূপেন্দ্র ও হেমপ্রভাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুক্তির উপায়।

আজি লক্ষৌর বন্ধনাগারে একটী নবীন যুবক মৃত্তিকা আসনে অবনত মুখে বসিয়া আছেন। প্রণয় নৈরাশ্যে, জীবন নৈরাশ্যে মুখে কালিমা পড়িয়াছে। চিন্তা নির্জ্জন বাসের একমাত্র সহচর, মনুষ্য অন্তঃকরণ কখন শূন্য থাকিতে পারে না। সুখ চিন্তাই হউক, দুঃখ চিন্তাই হউক, সুচিন্তা অথবা কুচিন্তাই হউক একা পাইলে স্তূপে স্তূপে আসিয়া মনুষ্যের মনকে আলোড়িত করে। ভূপেন্দ্র বন্ধন দশায় পতিত, সর্ব্বদা একাকী, চিন্তা সুযোগ পাইয়া অহোরাত্র তাঁহাকে উদ্বেলিত করিতেছে। গুরুজী টোপী কোন্ গৃহে বন্দী ভূপেন্দ্র তাহা জানেন না। বালিকা হেমপ্রভার কথা মনে করিয়া, তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িতেছিল। আপনার মুক্তি চিন্তা অপেক্ষা হেমপ্রভাকে কিরূপে মুক্ত করিবেন, সে উপায় চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে প্রবলরূপে ক্রিয়া করিতেছিল। এক একবার পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় ক্রোধভরে দাঁড়াইয়া উঠিতেছেন; কিন্তু ভূপেন্দ্র বন্দী, গৃহ হইতে এক পদও বাহির হওয়ার ক্ষমতা নাই; অমনি নিরাশা পীড়িত হৃদয়ে, মন কষ্টে আবার বসিয়া পড়িতেছেন।

জুলি। হেরল্ড, আজি তোমাকে যে কার্য্যের জন্য অনুরোধ করিব, তাহা আর কিছু নয়, শত্রুর প্রতি দয়া। শত্রুকে দয়া করিবে, ইহা আমাদের ধর্ম্মের এক প্রধান উপদেশ, তাহা তুমি জান; হেরল্ড, তুমি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, এ কাজ করিতে বোধ হয় সঙ্কুচিত হইবে না।

হের। শত্রু কে?

জুলি। একটী ক্ষত্রিয় যুবক, অদ্য কয়দিন যাবৎ বিদ্রোহী বলিয়া এখানে বন্দী হইয়া আসিয়াছে।

হের। তাহার নাম?

জুলি। জানি না।

হের। কোন্ ঘরে সে বন্দী আছে?

জুলি। আমাদের আবাস গৃহের নিকটস্থ গৃহে। আমি কয়দিন যাবৎ তাহার অবস্থা দেখিতেছি। তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখিলে কাহার না দয়া হয়? হেরল্ড, তাহাকে তোমার মুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

এক মুহূর্ত্তের জন্য হেরল্ডের ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হইল। তৎপরেই মনে মনে ভাবিলেন "ছি আমি জুলিয়ানার প্রতি অবিচার করিতেছি। স্ত্রী সুলভ দয়াই এই অনুরোধের প্ররোচক।" প্রকাশ্যে বলিলেন "যদি কমিশনর ইহা জানিতে পারেন?"

জুলি। হেরল্ড, তুমি বন্ধনাগারের একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, তোমার সাহায্যে বন্দী পলায়ন করিলে, ইহাতে যে, তুমি লিপ্ত আছ, কেহ জানিতে পারিবে না।

হেরল্ড একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "জুলিয়ানা, আমি জানি এ কাজ আমার নিতান্ত অন্যায়, তথাপি তোমার অনুরোধে আমি ইহা করিতে স্বীকৃত হইলাম। কল্য রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বন্দীকে পলায়ন করিতে বলিও। আমাদের দেশীয় একটী পরিচ্ছদ তাহাকে দিয়া

বলিবে, পলায়ন সময় যেন সেই পরিচ্ছদ পরিধানে বাহির হয়।" তিনি জুলিয়ানার নিকট একটী সাঙ্কেতিক শব্দ উল্লেখে কহিলেন "বন্দীকে বুঝাইয়া বলিও পলায়ন সময় কোন ইংরাজ সেনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে যেন এই শব্দটী উচ্চারণ করে, কোন বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না।"

জুলিয়ানা ভূপেন্দ্রের মুক্তির উপায় করিয়া, মনে মনে নিতান্ত সুখী হইল। অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া, হেরল্ড্‌কে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইল। হেরল্ড্‌ পুনরপি স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

-:o:-

মুক্তি।

যে দিবস জুলিয়ানা হেরল্ডের নিকট যাইয়া ভূপেন্দ্রের মুক্তির উপায় করিয়া আসিল, তাহার পর দিবস রজনী যখন ঘোরান্ধকারময়ী; কারাগার মধ্যে প্রায় সকলেই সুষুপ্ত; কেবল প্রহরীগণ বন্দুকহস্তে আপন আপন পাহারাদ্বার রক্ষা করিতেছে; সেই নীরব সময় অন্ধকার ভরা একটী গৃহমধ্যে চিন্তাবসন্ন ভূপেন্দ্র অৰ্দ্ধনিমীলিত নেত্রে তন্দ্রার কোলে শুইয়া আছেন। হঠাৎ একটী স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ভূপেন্দ্র স্বপ্নে দেখিতে ছিলেন, যেন স্বর্গ হইতে একটী দেবকন্যা আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন "ক্ষত্রিয়যুবক, তুমি স্বদেশ, স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য অপরিমিত চেষ্টা করিয়াছ, দেবতারা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তুমি বিপদুন্মুক্ত

হইয়া সুখী হও। তোমার স্বদেশবাসীদিগকে বলিও তাহারাও যেন তোমার ন্যায় এই মহৎব্রত অবলম্বন করিয়া, মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করে।" এই বলিয়া দেবকন্যা অন্তর্হিতা হইলেন, ভূপেন্দ্রের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, দারুণ কষ্টের সময়ও যেন তাঁহার মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। মনে নানা প্রকার কল্পনা আসিয়া উপস্থিত। মুক্ত হইয়া কি করিবেন তাহাই অধীরের ন্যায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে জাগ্রত স্বপ্নও অধিক ক্ষণ রহিল না; আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, নিজে নিজে বলিলেন "আমি পাগল, নহিলে আকাশে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছি কেন? আমার মুক্তির উপায় কি? সম্ভবতঃ দুই চারি দিবসের মধ্যেই শৃগাল কুকুরের ন্যায় বধ্য ভূমিতে মরিতে হইবে।" একটু থামিয়া আবার বলিলেন "মৃত্যু! মৃত্যুকে কোন্ কাপুরুষ ভয় করে? কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ন্যায় মরিতে পারিলাম না, শত্রুরক্ত প্লাবিত কলেবরে সমরক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না, সেই দুঃখই মনে রহিল। যুদ্ধক্ষেত্রে মরণাপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?" ভূপেন্দ্রের চক্ষুদ্বয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, গৃহ মধ্যে কতক্ষণ অঙ্গুলি দংশন করিতে করিতে পদচারণা করিলেন; পরে বলিলেন "হেমপ্রভা! তোমাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না।" এমন সময় বাহির হইতে গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল; ভূপেন্দ্র গৃহমধ্যে মনুষ্যপদ শব্দ শুনিয়া কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে আমার বিশ্রাম ভঙ্গ করিতে আসিয়াছ?" "উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবেন না, আপনার মঙ্গল কামনায়ই আমি এখানে আসিয়াছি" অতি কোমল, অতি মধুর স্বরে একটী রমণীকণ্ঠ হইতে এই কয়টী শব্দ বাহির হইল। ভূপেন্দ্র ভাবিলেন তাঁহাকে কেহ ব্যঙ্গ করিতেছে। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ ব্যঙ্গ করিবার সময় নয়, সাবধান, আমাকে অধিকতর উত্তেজিত করিও না।" আগন্তুক

বন্দীর মনের গতি বুঝিয়া, আর পুনরুক্তি করিল না, একটী যন্ত্রাবলম্বনে আলো জ্বালিল, ভূপেন্দ্রের বাসগৃহ দীপ্তিময় হইয়া উঠিল। গৃহ দীপ্তিময় হইলে ভূপেন্দ্র যেদৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মানসিক উত্তেজনা বিস্ময় ও কৌতূহলে পরিণত হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন, শ্বেতপ্রস্তরাভ একটী নবীন যুবতী-মূর্ত্তি স্বহস্তস্থ দীপালোকে ঝলসিতেছে। যুবতীর ঈষৎ দীর্ঘ গ্রীবার পশ্চাৎ ভাগে বঙ্কিম কেশগুচ্ছ স্তবক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, পৃষ্ঠোপরি ঝুলিতেছে; সুন্দর গৌরমুখে ওষ্ঠাধর অলক্ত রঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। যুবতীর পরিধানে গাউন, অঙ্গে কোন অলঙ্কার নাই, কেবল রক্তিমাভ কর্ণদ্বয়ে দুটী স্বর্ণদুল দুলিতেছিল। একটু বিশেষ দৃষ্টি করিলে, গাউনের নিম্ন প্রদেশ হইতে পদস্থ বুটের অগ্রভাগ মাত্র দৃষ্ট হইত। যুবতীর স্কন্ধে ইউরোপীয় পুরুষের একটী পরিচ্ছদ রহিয়াছে। ইউরোপীয় যুবতী কি উদ্দেশ্যে এই নিশীথ সময় তাঁহার বন্ধন গৃহে আসিয়াছে, কিছু বুঝিতে না পারিয়া, ভূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "সুন্দরি! আপনাকে এ সময় এ অপরিচিত বন্দীর গৃহে আগত দেখিয়া, আমার বিস্ময় বোধ হইতেছে; কোন্ ঘটনার উপর আপনার এই অচিন্তনীয় আগমন আরোপ করিব বুঝিতে পারিতেছি না।"

যুবতী। "মহাশয়, আমার এইরূপ সাহস যে রমণী—বিশেষতঃ যুবতী বিগর্হিত তাহা আমি জানি, কিন্তু না করিলে নয় তাই সাহস করিয়াছি। আপনার মুক্তির একটী উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছদটী পরিধান করিয়া এখনই এ স্থান হইতে পলায়ন করুন।" এই বলিয়া যুবতী স্কন্ধ হইতে পরিচ্ছদটী ভূপেন্দ্রের নিকট রাখিল। ভূপেন্দ্রের বিস্ময় দ্বিগুণিত হইল, অবাক্ হইয়া যুবতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

যুবতী। অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছেন?

ভূপে। "আমি আপনাদের শত্রু, শত্রুকে আপনি কেন মুক্ত করি-বেন ?" "কেন ? কেন ?" এই বলিয়া যুবতী একটু অন্যমনস্কা হইল। ভূপেন্দ্র উত্তর অপেক্ষায় কিছুকাল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "ইহাতে আপনার স্বার্থ কি ?" যুবতী এবার একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল "স্বার্থশূন্য হইয়া কি কেহ কোন কাজ করিতে পারে না ?" যুবক নিরুত্তর হইলেন।

যুবতী। "আপনি শীঘ্র প্রস্তুত হউন, বিলম্ব করিলে কার্য্য সিদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।" নিজের মুক্তির উপায় হইল, কিন্তু হেমপ্রভা ও গুরুজী টৌপী কারাগারেই রহিলেন, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া ভূপেন্দ্রের মন যাইতে চায় না। পরে যখন ভাবিয়া দেখিলেন, কারাগার হইতে বাহির হইতে না পারিলে উহাদিগের উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই, তখন পলায়নই স্থির করিয়া যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পলায়নের সুবিধা কি ?"

যুবতী। সে উপায় আমি করিয়াছি। আমাদের দেশীয় এই পরি-চ্ছদ পরিয়া বাহির হইলে আপনাকে কেহ শত্রু বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। পলায়ন সময় কোন ইংরাজ সেনার সহিত দেখা হইলে "ফ্রেণ্ড" এই শব্দটী উচ্চারণ করিবেন, কেহ কোন বাধা দিবে না।

ভূপেন্দ্র তখন ইউরোপীয় রমণীর নিস্বার্থ দয়ার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পুর্ব্বোক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। পরিধান সমাপনান্তে যুবতীকে বলিলেন "আপনি দেবতার ন্যায় নিস্বার্থ ভাবে যে, আমাকে মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তজ্জন্য আপনার প্রত্যুপকার কি করিব ? এখন অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে পারিলে সম্ভবতঃ আমাকে কোন নিভৃত স্থানে যাইয়া লুকাইয়া থাকিতে হইবে।"

যুবতী। আপনার নিকট কোন প্রত্যুপকারের অভিলাষী হইয়া আমি এ কার্য্য করিতেছি না। তবে একটী মাত্র অভিলাষ হইতেছে, যখন সম্পূর্ণ বিপদুন্মুক্ত হইয়া অভীষ্ট স্থানে পৌছিবেন; সে সংবাদ আমাকে গোপনে জানাইলে সুখী হইব।" যুবতী ভূপেন্দ্রকে বিলম্ব করিতে দেখিয়া বলিল "আর বিলম্ব করিবেন না।" ভূপেন্দ্র গমনোদ্যত হইয়া, যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নিকট কোন্ নামে পত্র লিখিব ?"

যুবতী। "জুলিয়ানা পিটার্স্‌ফিল্ড্"। "ঈশ্বর আপনাকে সুখী করুন" এই বলিয়া ভূপেন্দ্র গৃহ হইতে বাহির হইলেন। জুলিয়ানা অন্ধকার মধ্যে তাঁহাকে যতক্ষণ পারিল দেখিল, এবং কোন গোলযোগ হয় কিনা শুনিবার নিমিত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। ভূপেন্দ্র দ্বারে পৌঁছিয়া দেখিলেন বন্দুক হস্তে এক জন ফিরিঙ্গী সেনা পাহারা দিতেছে। সে ভূপেন্দ্রকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিল "কে যাও ?" তিনি যুবতী-উপদিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিলেন। গোরা শিপাহী সাঙ্কেতিক শব্দ শুনিয়া এবং আলোকে আসিলে পর তাঁহার ইউরোপীয় পরিচ্ছদ দৃষ্টি করিয়া, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না; ভূপেন্দ্রও নিরুদ্বেগে বাহির হইলেন। জুলিয়ানা যখন কারাগার দ্বারে কোন গোলযোগ শুনিল না, তখন ভূপেন্দ্রের পলায়নে কোন ব্যাঘাত হয় নাই ভাবিয়া, নিজের শয়ন গৃহে যাইয়া শয়ন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অচিন্তনীয় মিলন।

রজনী প্রভাত না হইতেই ভূপেন্দ্র সহর ছাড়িয়া এক গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রাম পার হইলে পর রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। বৃক্ষ কোলে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। সূর্য্য তিমির নাশক, কাক সমূহ ভাবিল, যদি তাহাদিগকে তিমির বোধে বিনাশ করে, এই ভয়ে আপনাদিগকে কাক বলিয়া পরিচয় দিতে, কা, কা, শব্দে পূর্ব্বাভিমুখে ছুটিল। শৃগালেরা সময় ফুরাইয়াছে ভাবিয়া, ঝোপের মধ্যে যাইয়া লুকাইল। অন্যান্য হিংস্র জন্তুগণ সমস্ত রাত্রি হিংস্র কার্য্য সম্পাদন করিয়া, অরণ্য গৃহে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বদিক্ হাসিতে হাসিতে আসিয়া সকলকে বলিল সূর্য্য আসিতেছে। ইহা শুনিয়া মলয় সমীরণ আহ্লাদে ডগমগ হইয়া নাচিতে লাগিল, ফুলবধূরা তৎদর্শনে হাসিয়া পড়িল। সূর্য্যদেব প্রথমতঃ বৃক্ষগণের মাথায়, পরে সর্ব্বস্থানে আলোরাশি রিক্ত হস্তে বিতরণ করিতে লাগিল। ভূপেন্দ্র এক নির্জ্জন পথ বাহিয়া অনেক ক্ষণ হাঁঠিলেন। বেলা যখন এক প্রহর, তখন দেখিলেন তিন জন লোক তাঁহারদিকে আসিতেছে। লোকত্রয় মধ্যে একজন দীর্ঘকায়, পরিধানে পশ্চিম দেশীয় বড় মানুষদের পরিচ্ছদ, কক্ষে একখানা তরবারি, তরবারির বাট বাম হস্তের মুষ্টিতে ধৃত। অন্য দুই ব্যক্তিও তরবারি হস্তে প্রথমোক্ত ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। সঙ্গীদ্বয় দীর্ঘকায় ব্যক্তির দেহরক্ষক। পরস্পর প্রত্যভিমুখ গমন নিবন্ধন দুই পক্ষ আসিয়া শীঘ্রই মিলিত হইল। ভূপেন্দ্রের পরিধানে ইউরোপীয়

পরিচ্ছদ দৃষ্টে দীর্ঘকায় ব্যক্তি বলিলেন "শিবসিংহ, প্রস্তুত হও, ধর্ম্মবিদ্বেষী ফিরিঙ্গী সম্মুখে।" শিবসিংহ ও বীরপাল অমনি কোষ হইতে তরবারি বাহির করিল। দীর্ঘকায় ব্যক্তিও প্রজ্বলিত তরবারি বাহির করিয়া সদর্পে দণ্ডায়মান হইলেন। ভূপেন্দ্র এ ব্যাপার দর্শনে চকিত হইয়া বলিলেন "মহাশয়, আমাকে যাহা ভাবিতেছেন আমি তাহা নই, আমি আপনার স্বজাতীয় ক্ষত্রিয়।"

দীর্ঘকায়। বঞ্চক! ছলনা বাক্যে এ হৃদয় ভুলিবার নয়। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হও।

ভূপে। "আমি এরূপ বাক্য কাহারো মুখ হইতে সহ্য করিতাম না, কিন্তু দেখিতেছি আমার পরিচ্ছদ দৃষ্টে আপনার এরূপ ভ্রম হইয়াছে। একটু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখুন, তাহা হইলে আমার কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। প্রাণ ভয়ে কখন এমুখ হইতে ছলনা বাক্য বাহির হয় না।" দীর্ঘকায় ব্যক্তি জানিতেন তাঁহার স্ত্রী পুত্র ইংরাজ কর্তৃক নিহত হইয়াছে, তিনি সক্রোধে বলিলেন "বীরপাল! ফিরিঙ্গীকে বধ কর। যে ফিরিঙ্গী হস্তে আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, তান্তিয়া টোপীর ধমনীতে বিন্দুমাত্র রক্ত থাকিলেও সে ইহার প্রতিশোধ লইবে।" ভূপেন্দ্র যে তান্তিয়া টোপীর নাম মাত্র শুনিয়া আসিতেছিলেন, চক্ষে কখন দেখেন নাই, আজি তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়া বলিলেন "পিতঃ! ক্ষান্ত হউন, মনোনিবেশ পূর্ব্বক আমার নিবেদন শুনুন।" তান্তিয়া টোপী সঙ্গীদ্বয়কে ক্ষান্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন "কি বলিতে চাহ বল।"

ভূপে। আপনার ভ্রাতা ও কন্যা লক্ষ্ণৌ ইংরাজ কারাগারে বন্দী।

তান্তি। কি বলিলে, আমার ভ্রাতা ও কন্যা ইংরাজ কারাগারে?

ভূপে। "আজ্ঞে হাঁ, আমি তাঁহাদের সহিত এক গোপন আবাসে

কতকদিন অবস্থান করিয়াছিলাম, পরে ইংরাজ সেনা কর্ত্তৃক একত্র ধৃত হইয়া, ইংরাজ কারাগারে বন্দী হই।” এই বলিয়া তিনি যেরূপে মুক্ত হইলেন ও যেরূপে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন তৎসমুদয় আনুপৌর্ব্বিক তান্তিয়া টোপীকে বলিলেন। ক্রোধে তান্তিয়া টোপীর নয়ন হইতে অগ্নি বাহির হইতে লাগিল ; উন্মত্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন “বীরপাল, চল, দেখিব কেমন করিয়া পাপাত্মারা তান্তিয়া টোপীর ভাইকে ও কন্যাকে বন্দী করিয়া রাখে।”

ভূপে। “আপনি অধীর হইবেন না, তাঁহারা যে স্থানে আবদ্ধ রহিয়াছেন সেখান হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করা সহজ ব্যাপার নয়। আমিও তাঁহাদের উদ্ধারার্থেই কৃতসঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছি। শুনিয়াছি আর তিন দিন পরে বন্দীদের ফাঁসি হইবে।” তান্তিয়া টোপীর মুখ শুষ্ক হইল। তিনি একটু স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ব্যস্ততার সহিত বলিলেন “শিব সিংহ, বীরপাল, আর সময় নাই, প্রাণ দিয়াও গুরুজীও হেমপ্রভাকে উদ্ধার করিতে হইবে।”

ভূপে। “আপনি অস্থির হইবেন না, আমার বেশ বোধ হইতেছে বন্দীদের প্রাণ দণ্ডের সময় সেখানে অধিক সৈন্য থাকিবে না। আমরা সেই সময়েই উহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিব। ইতি পূর্ব্বে আমাদিগকে দলবল প্রস্তুত করিতে হইবে। আপনি আসুন, আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়।” এই বলিয়া চারি জনেই সত্বর পদে পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ফাঁসিকাষ্ঠ।

তিন দিন হইল ভূপেন্দ্র পলায়ন করিয়াছেন। ইংরাজ অনুসন্ধানকারীরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। গুরুজী টোপীর প্রাণদণ্ডের দিন উপস্থিত; ফাঁসি কাষ্ঠ সজ্জিত; লম্বিত রজ্জু গুরুজীর গ্রীবাকে গ্রাস করিবার জন্য যেন চক্রাকারে মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। দর্শকগণ সকলেই এই মর্ম্মভেদী দৃশ্যের প্রতীক্ষা করিতেছে। কিছুকাল পরে প্রহরী বেষ্টিত গুরুজী টোপী বধ্য ভূমিতে আনীত হইলেন। মুখে ভীতি চিহ্নমাত্র নাই; গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব না আসিলে ফাঁসি হইতে পারে না, তৎপ্রতীক্ষায় বিলম্ব হইতে লাগিল। কতকক্ষণ পরে ঘোটকারোহণে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একবার এপাশ এক বার ওপাশ চাহিয়া,একটী অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া,বলিলেন "ফাঁস"! এই কথা বলিয়া সাহেবজী অন্তর্দ্ধান হইলেন। জল্লাদ একধারে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল,অমনি অগ্রসর হইয়া গুরুজীকে ফাঁসিকাষ্ঠের সোপান দেখাইয়া বলিল "উঠ।" নির্ভীক, বদ্ধ হস্ত গুরুজী সোপানাবলী অবলম্বনে ফাঁসি কাষ্টে আরোহণ করিলেন। জল্লাদকে অনুসরণ করিতে দেখিয়া বলিলেন "কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, আমার যাহা বলিবার বলিয়া যাই।" জল্লাদ স্থগিত হইল। গুরুজী ফাঁসি কাষ্ঠে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন "দর্শকমণ্ডলী, আমি চলিলাম, আজি জীবনের কার্য্য করিয়া আমি মরিতে চলিলাম। জীবনের প্রিয় পদার্থ স্বাধীনতা, জীবন হইতে প্রিয়তর পদার্থ ধর্ম্ম।

আমরা অনেক দিন হইতে প্রিয় সামগ্রী স্বাধীনতা হারাইয়াছি ; কিন্তু ধর্ম্ম—সে সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম এখন পর্য্যন্তও আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত রহিয়াছে। যে আমাদের স্বাধীনতা নাশ করে, সে আমাদের পার্থিব জীবনকে হীন করিল। কিন্তু ধর্ম্মের উপর—জীবনের সার পদার্থের উপর যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সে আমাদের অনন্ত জীবনকে নাশ করিতে উদ্যত। আজি সেই ধর্ম্মের জন্য,—সেই একমাত্র প্রিয় পদার্থের জন্য, আমি মরিতে চলিলাম, স্বর্গরাজ্যে আমি সুখী হইব।" গুরুজী আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ঐ দেখ, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, আকাশবাসী দেবতাগণ আমাকে ডাকিতেছেন।" তিনি পুনরপি বাহু দেখাইয়া বলিলেন "এই বাহুবলে শত শত ধর্ম্ম বিদ্বেষী শত্রুকে বধ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন করিয়াছি, আমি স্বর্গে চলিলাম। ঐ শোন দেবতারা আবারও বলিতেছেন "দেশোদ্ধার, ধর্ম্মোদ্ধারের জন্য যে প্রাণ দিতে চাহিতেছে, আমরা তাহার জন্য স্বর্গে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখি। যে নরাধম সেই দেশ, সেই ধর্ম্ম উদ্ধারে বিমুখ হইয়া, তুচ্ছ অসার জীবনের জন্য ভীত হইয়া, শত্রুর দাস হইয়া থাকে, শত শত মহৎ কার্য্য বলেও যদি সে স্বর্গে আসিতে চায়, আমরা তাহাকে সজোরে স্বর্গভ্রষ্ট করিয়া অনন্ত নরকের দাস করিয়া রাখি। দেশহিতৈষী দেবতার প্রসাদ ভোগী. স্বদেশ বিরুদ্ধাচারী সর্ব্বজনঘৃণিত, এবং নরকই তাহার উপযুক্ত স্থান। ভ্রাতৃগণ ইহা নিশ্চয় জানিও, যে আমাদের স্বাধীনতা নাশ করিবে সে ক্রমে ক্রমে আমাদের ধর্ম্মনাশ করিতেও উদ্যত হইবে। আমার শেষ প্রার্থনা, যদি ধর্ম্ম ও দেশ উদ্ধারের জন্য আমার ন্যায় মৃত্যুপথ অবলম্বন করিতে হয়, অকুতোভয়ে তাহা করিও। পৃথিবীতে, স্বর্গে, তোমাদের অক্ষয়, অনন্ত কীর্ত্তি বাজিয়া উঠিবে" এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন এবং পরে হেমপ্রভাকে একবার দেখিতে চাহিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যেই হেমপ্রভা তথায় আনীত হইল। তাহার নয়ন হইতে অনর্গল ধারায় জল পড়িতেছিল। যে নির্ভীক গুরুজী টোপী অকুতোভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, যাঁহার চক্ষে এক বিন্দুও অশ্রু এপর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই, বালিকা হেমপ্রভার দিকে চাহিয়া, সেই স্নেহ প্রতিমার কষ্ট দেখিয়া, সেই গুরুজীর নির্ভীক চক্ষু হইতে দরদর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি ভগ্নস্বরে হেমপ্রভাকে বলিলেন "হেমপ্রভা, আমি যাই, মনে রাখিও তুমি ক্ষত্রিয় বালিকা, ক্ষত্রিয়-রক্তে তোমার জন্ম; মা! ধর্ম্ম রক্ষাহেতু যদি মৃত্যুকেও সহায় করিতে হয় তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইও না। আমি আশীর্ব্বাদ করিয়া যাই, ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া স্বর্গরাজ্যে আসিয়া যেন আবার আমার কোলে বসিতে পার।" হেমপ্রভা অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। গুরুজী টোপী ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন "হে আকাশবাসী দেবগণ! আমার হেমপ্রভা—আমার হৃদয়ের ধন হেমপ্রভাকে রক্ষা করিও" এই বলিয়া কতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে হেমপ্রভার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, পরে জল্লাদকে বলিলেন "হইয়াছে, এখন তোমার কাজ কর।" জল্লাদ অমনি দ্রুতপদে ফাঁসি কাষ্ঠ আরোহণ করিল। লম্বিত রজ্জু গুরুজীর গ্রীবাদেশে সংযত করিয়া, তাঁহার মুখ একটী টুপীতে ঢাকিয়া দিয়া, নীচে নামিয়া আসিল এবং এই প্রাণদণ্ডকার্য্যে নিজের নির্দ্দোষিতা অনেকবার উচ্চৈঃস্বরে প্রমাণ করিয়া একটী যন্ত্র ফেলিয়া দিল। গুরুজীর পদের নিম্ন হইতে একখানা তক্তা সরিয়া গেল, তাঁহার বিশাল দেহ রজ্জুবদ্ধ হইয়া ঝুলিতে লাগিল।

যেস্থানে এই শোচনীয় ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার অতি নিকটেই হঠাৎ অনেক অশ্বের পদশব্দ শুনা যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক দল বিদ্রোহী শিপাহী অশ্বারোহণে আসিয়া সেখানে

উপস্থিত হইল। তান্তিয়া টোপী ও ভূপেন্দ্র বিদ্রোহী দলের অধিনায়ক হইয়া আসিয়াছেন। ইংরাজ প্রহরীগণের সহিত সামান্য যুদ্ধ করিতে করিতে যেখানে হেমপ্রভার নবীন দেহ অচেতনাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছিল, তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলেন।

তান্তিয়া টোপী রজ্জুবদ্ধ-লম্বিত-প্রাণশূন্য-ভ্রাতৃদেহ দেখিয়া, বজ্রাহতের ন্যায় ঘোটকের উপর বসিয়াই স্থির নির্জ্জল চক্ষে তৎপানে চাহিয়া রহিলেন। ভূপেন্দ্র তাঁহাকে হস্ত দ্বারা একটু তাড়না করিয়া বলিলেন "এ শোকের সময় নয়।" তান্তিয়া টোপীর যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি "যথার্থ বলিয়াছ ভূপেন্দ্র" এই বলিয়া এক জন শিপাহীকে ভ্রাতৃদেহ নামাইয়া লইতে আদেশ করিলেন। শিপাহী আদেশ প্রাপ্তমাত্র তরবারী দ্বারা রজ্জু কাটিয়া, গুরুজীর দেহ ঘোটকের উপর তুলিয়া লইল। ভূপেন্দ্র হেমপ্রভাকে দেখাইয়া বলিলেন "ইহাকে উঠাইয়া লও।" নিমিষমধ্যে উহারা শূন্যবন্দুকধারী কয়েকজন প্রহরীকে বধ করিয়া, হেমপ্রভা ও গুরুজীকে লইয়া প্রস্থান করিল। তান্তিয়া টোপী গমন কালে বলিয়া গিয়াছিলেন "পাপাত্মা ফিরিঙ্গিগণ! জানিস তান্তিয়া টোপী জীবিত রহিল, তোদের শোণিতে সে ভ্রাতৃশোকের শান্তি বিধান করিবে।" এই সমস্ত কার্য্য এত অল্পক্ষণের মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছিল যে, বধ্যভূমিস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট ইহা স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিদায়

চন্দ্রালোকে সরযুর জল খেলিয়া খেলিয়া ছুটিতেছিল। ক্ষুদ্র বীচি-মালার আলোড়নোপরি চন্দ্ররশ্মি পতিত হওয়ায় বাড়বানল বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। চন্দ্রমা যেন শত শত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জলের তলে নাচিতেছেন, অল্পসলিলা সরযু ইহাতে অতল সলিলা বলিয়া বোধ হইতেছিল। নিকটে অন্য কোন মনুষ্য বসতি নাই, তীরে উচ্চ বৃক্ষা-বলী খদ্যোৎমালায় সজ্জিত হইয়া, জলদর্পণে মুখ দেখিতেছে। কিনারায় একখানা নৌকা বাঁধা—তাহার প্রবেশ দ্বার ভিন্ন সাশী সমুদয় বন্ধ; মাঝিগণ পাল বিছাইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তীরে অতি সন্নিকটে বৃক্ষাবলীর নীচে মৃদু আলোকে বসিয়া, কয়েকটী লোক পরামর্শ করিতেছিলেন। তন্মধ্যে যিনি পরিণত বয়স্ক, তিনি একটী যুবককে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছিলেন, অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি নিকটে বসিয়া তাহাই শুনিতেছিল। পরিণতবয়স্ক লোকটী যুবকের মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন "আমাদের এখন এক মুহূর্ত্তও এদেশে থাকা উচিত নয়। ইংরাজ অনুসন্ধানকারীদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সকলকেই ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।"

যুবক। আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারি, আপনারা এখন কতক দিন ছদ্মবেশে অবস্থান করুন।

পরিণত। আমি এই সময় নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিব? তাত্তিয়া টোপীর জীবনে তাহা কখনও হইবে না; আমার সংকল্প আমি স্থির

করিয়াছি। আমাকে অগৌণেই যাইয়া ঝান্সির রাণীর সাহায্য করিতে হইবে।"

ভূপে। আপনাকে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে কি না, এখন আমাদের একটু বিশেষ সাবধান হওয়াই কর্ত্তব্য। শত্রুগণ অন্যান্য বিদ্রোহী অপেক্ষা আমাদের প্রতি অধিকতর ক্রুদ্ধ।

তান্তি। ভুপেন্দ্র, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও, তান্তিয়া টোপী শত্রু নিপাত করিবার জন্য বাহুতে যত বল ধরে, শত্রু ভুলাইতে হৃদয়ে তাহাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছলনা ধরে না।

ভূপে। আমি আপনার ন্যায় বীরপুরুষের জন্য কোন ভয় করিতেছি না, কিন্তু হেমপ্রভা সঙ্গে থাকিবে বলিয়াই মনে ভয় হইতেছে।

তান্তি। ইহার সদুপায় আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি। লুমাতে ব্রহ্মানন্দস্বামী নামে আমার পরম হিতৈষী একজন ক্ষত্রিয় উদাসীন বাস করেন, হেম-প্রভাকে তাঁহার নিকট রাখিয়া যাইব। ভূপেন্দ্র, ক্ষত্রিয়-যুবক, ধর্ম্মবিদ্বেষী ফিরিঙ্গী ক্ষত্রিয়ের নিকট অমার্জ্জনীয়; ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিতে ভুলিও না। দুইজনে এক স্থানে থাকা অপেক্ষা বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া, কার্য্য করিলে অধিক সুফলের সম্ভাবনা। তুমি পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া, তথাকার সিপাহীদিগকে উত্তেজিত কর, পশ্চিমে যাহা করিতে হয় আমিই করিব।

ভূপেন্দ্রের মন যেন একটু কেমন হইল। কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ থাকিল না; একটু চিন্তা করিয়া, তান্তিয়া টোপীর অভিমতই অনুমোদন করিয়া বলিলেন "যে আজ্ঞা, আমি তাহা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। কিন্তু কয়েকদিন আমাকে অযোধ্যায় থাকিতে হইবে, পক্ষ মধ্যেই পূর্ব্ববঙ্গে রওনা হইব।"

তান্তি। জগদীশ্বর তোমার সদিচ্ছা পূর্ণ করুন।

ভূপে। "আপনাদের সহিত আর কখন দেখা হয়, কি না হয় তাহার স্থিরতা নাই, তবে একবার হেম"—এই বলিয়া অবনত মস্তকে ভূপেন্দ্র নীরব হইলেন। তান্তিয়া টোপীর মুখ একটু গম্ভীরভাব ধারণ করিল; তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভূপেন্দ্রের মুখপানে একবার চাহিলেন; সে দৃষ্টি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য চেষ্টা করিল। শত শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া,যে ভূপেন্দ্রের একটী কেশও কখন কম্পিত হয় নাই,তিনি আজি এই দৃষ্টি স্থিরভাবে সহ্য করিতে পারিলেন না; বিচারকের নিকট অপরাধীর ন্যায় তাঁহার হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তান্তিয়া টোপী কিছুকাল থাকিয়া বলিলেন "ভূপেন্দ্র, আমরা এখন শত্রুহস্ত হইতে মাতৃভূমির উদ্ধার কল্পে সকলে সমরক্ষেত্রে নামিয়াছি। এ সার চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তাকে এ সময় মনে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। ভরসা করি বয়োজ্যেষ্ঠ স্থতরাং অধিকতর সংসারাভিজ্ঞ লোকের এ উপদেশটী ভুলিবে না।" ভূপেন্দ্র চুপ করিয়া রহিলেন। তান্তিয়া টোপী পুনরায় বলিলেন "ভূপেন্দ্র, হেমপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া না গেলে সে দুঃখিত হইবে। একবার তাহার সহিত দেখা করিয়া আইস।"

ভূপেন্দ্র গাত্রোত্থান করিয়া সরযু-তীরে যেখানে নৌকা বাঁধা ছিল, সেখানে আসিয়া "মাঝি মাঝি" বলিয়া ডাকিলেন। নিদ্রাভিভূত মাঝিগণ সুপ্তোত্থিত হইয়া, চোক্ রগড়াইতে রগড়াইতে বিরক্তি স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কে"।

ভূপে। "আমি নৌকাতে যাইব।" মাঝিগণ অমনি শশব্যস্তে কাষ্ঠনির্ম্মিত সিঁড়ি নামাইয়া দিল। ভূপেন্দ্র নৌকাতে উঠিলেন। নৌকাতে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সম্মুখ প্রকোষ্ঠে দুইজন পরিচারিকা,

তাহাদের কোন বিষয়ের ভাবনা নাই, আজি বেতন পাইয়াছে, তাহারা সুখে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। ভূপেন্দ্রের গৃহ প্রবেশ তাহারা টের পাইল না। তিনি যেখানে শোকসন্তপ্তা হেমপ্রভা শয়ান রহিয়াছিল, সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। হেমপ্রভা বিছানায় পড়িয়া পিতৃব্যের লম্বিত মৃতদেহ, মাতা প্রভৃতি পরিজনবর্গের নিধন ইত্যাদি ভাবিতেছিল। ভূপেন্দ্র ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "হেমপ্রভা, ঘুমাইয়াছ?" হেমপ্রভা "কে ভূপেন্দ্র?" এই বলিয়া পাশ ফিরিয়া উঠিয়া বসিতে উদ্যতা হইল।

ভূপে। তোমার শরীর এখন সুস্থ আছে ত?

হেম। "আমি এখন একটু ভাল বোধ করিতেছি। ভূপেন্দ্র, বাবাকে আবার পাইলাম, কিন্তু যিনি নিজের স্ত্রী পুত্র-শোককে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, একমাত্র আমার জন্যই কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, আমার সেই পিতৃব্যের—আমার পিতৃ সদৃশ পূজ্যতম সেই পিতৃব্যের শোচনীয় মৃত্যু—" এই কথা বলিতে বলিতে হেমপ্রভার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, উপাধানে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। হেমপ্রভার নয়নবারি যেন ভূপেন্দ্রের নয়নবারিকে আকর্ষণ করিয়াছে; বালিকার কষ্টে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি কিছু কাল পরে উত্তরীয় বস্ত্রে হেমপ্রভার চক্ষুজল মুছাইয়া দিয়া এবং তাহার হস্ত নিজ হস্ত মধ্যে রাখিয়া বলিলেন "হেম-প্রভা, এ অসার চিন্তা করিয়া কেন শরীর নষ্ট করিবে? নশ্বর জীবন লইয়া আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি, সকলকেই এক দিন না এক দিন মরিতে হইবে। পূজ্য গুরুজী টৌপী ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিয়া, প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, ধর্ম্মের জন্য নশ্বরদেহ নশ্বর পৃথিবীতে রাখিয়া, স্বর্গ রাজ্যে যাইয়া দেব সহবাস করিতেছেন, স্বর্গবাসী পিতৃব্যের জন্য বৃথা আক্ষেপ করিও না।"

হেম। আমি কাকাকে কেমন করিয়া ভুলিব?

ভূপে। তাকি আমি বুঝি না? কিন্তু হেমপ্রভা, তুমিই এখন তোমার পিতার এক মাত্র সান্ত্বনা-স্থল; তোমাকে অসুখী দেখিলে তিনি কাতর হইবেন। তোমরা এখন এদেশ ছাড়িয়া যাইবে। জগদীশ্বরের কৃপায় পিতার সহিত তোমার আবার সাক্ষাৎ হইল; তোমার বিপদ আশঙ্কায় আমাকে সর্ব্বদা তত দূর চিন্তা করিতে হইবে না। সর্ব্বদা তাহার মনস্তুষ্টি সাধন করিও।

হেম। তুমি কোথায় থাকিবে?

ভূপে। কিছুদিন এদেশেই থাকিব।

হেম। তা তুমি এখানে কেমন করিয়া থাকিবে? রাজ্য এখন শত্রু সঙ্কুল।

ভূপে। শত্রুকে আমি তৃণবৎ জ্ঞান করি, আমার জন্য চিন্তা করিও না।

হেম। আমাদের সঙ্গে গেলে কি হয় না?

ভূপে। "না, হেমপ্রভা, তোমার পিতার ইচ্ছা আমারও কর্ত্তব্য যে পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করি। আপাততঃ এখানে গোপনে থাকিয়া আমাকে আমার বিষয় সম্পত্তির একটা বন্দোবস্ত করিতে হইবে, তৎপর পূর্ব্ববঙ্গে রওনা হইব। কর্ত্তব্যের অনুরোধে কি না করিতে হয়? কর্ত্তব্য আর ইচ্ছা যদি এক হইত–" এই বলিয়াই ভূপেন্দ্র নীরব হইলেন। বালিকার কাণে কর্ত্তব্য শব্দটা আজ বড় কঠোর বোধ হইল; "পিতার ইচ্ছা" এই কথাটাও বড় মনোমত হইল না। ভূপেন্দ্র-রাজ্য যদি তাহার আয়ত্ত হইত এবং তাহার ইচ্ছাতেই যদি সব হইতে পারিত"—বালিকা ইহাই ভাবিতে লাগিল। বালিকাকে চিন্তানিমগ্না দেখিয়া, ভূপেন্দ্র আবার বলিলেন "হেমপ্রভা, যদি তোমাকে পুনরায় দেখিবার পূর্ব্বে মরি, তাহা হইলে কি এই চিন্তা লইয়া মরিতে

পারিব যে, আমার জন্য একটি হৃদয় হইতে অন্ততঃ একটী দীর্ঘ নিশ্বাসও বাহির হইবে?" বালিকা অস্থিরতার সহিত বলিল, "ভূপেন্দ্র, ভূপেন্দ্র, কেন এরূপ বলিতেছ?" ভূপেন্দ্র হেমপ্রভার চিবুক ধরিয়া বলিলেন "পাগল, আমি কেবল একটা কথার কথা বলিতেছিলাম। অবশ্য সুদিন হইবে, অবশ্য তোমাকে পুনরায় দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতে পারিব। হেমপ্রভা, তবে এখন চলিলাম।" বালিকা প্রথমতঃ কোন উত্তর করিতে পারিল না, তাহার চক্ষু জলে পূরিয়া গেল। পরে মৃদুস্বরে বলিল "তুমিত রহিলে, কিন্তু সাবধানে থাকিও। ভূপেন্দ্র ক্ষণেক সেই সরল মূর্ত্তি প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া বাহির হইলেন। হেমপ্রভাও সজল নয়নে গমনশীল ভূপেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল। মনে মনে শত বার বলিল "দেবতা, আমার ভূপেন্দ্রকে নিরাপদে রাখিও।"

সকলে নৌকায় আরোহণ করিল। মাঝিভাই নিজের গদীতে যাইয়া হাল ধরিয়া বসিল এবং বহুদর্শীর ন্যায় নানা প্রকার আদেশ বাক্য প্রয়োগে অনুজ্ঞা রূপের সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নৌকা চন্দ্রালোকে ভাটিমুখে ছুটিল। তান্তিয়া টোপী সাসী খুলিয়া ভূপেন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন। হেমপ্রভার নিতান্ত ইচ্ছা একবার সাসীর ভিতর দিয়া মুখ বাহির করে, কিন্তু পিতৃসমক্ষে পারিয়া উঠিতেছে না। নৌকা অনেক দূর চলিয়া গেলে পর নির্ব্বোধ বালিকা নিতান্ত সাহসের উপর ভর করিয়া, খুব বীরের ন্যায় একটা কাজ করিয়া ফেলিল। হেমপ্রভা থু থু ফেলিবার ভাণ করিয়া, সাসী পথে মুখ বাড়াইল। চন্দ্র দ্বিতীয় চন্দ্র দর্শনে যেন হীনপ্রভ হইল; বালিকা মনের দুঃখে বিধাতার ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিয়া, মনে মনে বলিল "বিধাতা, চন্দ্রকে কেন সূর্য্যের ন্যায় আলোকময় করিলে না?" পরে সাসী বন্ধ করিয়া নৌকার ভিতরে মনোকষ্টে শুইয়া রহিল।

যে নৌকা ভূপেন্দ্রের হৃদয় লইয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, তিনি যতক্ষণ দেখিতে পাইলেন, স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেন; অবশেষে তরবারি হস্তে এক অরণ্য পথে চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:—:০:—:—

অনিবার্য্য হৃদয়ের বেগ।

ভূপেন্দ্র তাস্তিয়া টোপী হইতে পৃথক্ হইয়া, কতক দিন গোপনে অযোধ্যায় অবস্থান করিলেন। বিষয় সম্পত্তির কোন বিশেষ বন্দোবস্ত হইল না; অবশেষে অযোধ্যা অবস্থান নিষ্ফল ভাবিয়া, পূর্ব্ববঙ্গে রওনা হইলেন। যে দিন ভূপেন্দ্র অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া যান্, তাহার কয়েক দিবস পূর্ব্বেই ইংরাজ কারাগার হইতে মুক্তিকারিণী জুলিয়ানাকে অঙ্গীকারানুসারে গোপনে পত্র লিখিয়া পাঠান। করুণহৃদয়া ইউরোপীয় যুবতী যথাসময়ে ভূপেন্দ্রর পত্র পাইয়া প্রফুল্লচিত্তে তাহা পাঠ করিল। ভূপেন্দ্র জুলিয়ানাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত ছিল;—

দয়ার প্রতিমূর্ত্তি! আপনি যে কেন আমার জীবন বাঁচাইলেন বুঝিতে পারি না। কারাগারে ছিলাম, পলায়নের সময় ভিন্ন আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ বা পরিচয় হয় নাই। আপনি কি দেবী, না মানবী, আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার জীবন বাঁচাইয়াছেন, এ কথা প্রকাশ হইলে আপনার

বিশেষ বিপৎপাতেরই কথা। স্বার্থ সাধন হইতেছে বলিয়াই বোধ হয় ইহা আমি তখন চিন্তা করি নাই; কিন্তু এখন ভাবিয়া বড় ভীত ও চিন্তিত হইতেছি। এ দুর্ভাগার জন্য যদি আপনার কোন বিপদ হয়, পরিতাপের সীমা থাকিবে না। আপনি এরূপ বিপদের আশঙ্কা সত্বেও নিস্বার্থভাবে আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা শুনিলে কেনা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারে? হয় ত আপনি কোন দেব-বালা ফিরিঙ্গী-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনা হইতেই আমার মনোবেদনা জানিতে পারিয়া, আমাকে মুক্ত করিয়া দেবকার্য্য হইতেও উচ্চ কার্য্য সাধন করিয়াছেন। এ অকৃতজ্ঞ আপনার দেবকার্য্যের প্রতিদান কিছুই করিতে পারে নাই। সময় মন্দ হইয়াছে, ভবিষ্যতে যে পারিবে এরূপও আশা নাই। ইচ্ছা ছিল কয় দিন এদেশেই অবস্থান করি, কিন্তু বিদ্রোহীগণের প্রতি যেরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে এদেশে থাকিলে, আপনি যে জীবন একবার বিপদ-সাগর হইতে তুলিয়া দিয়াছেন, তাহা আবার ডুবিবে। আপনাকে আমার কোন কথা বলিতে ভয় হয় না, আমাকে শীঘ্রই পশ্চিমদেশ ছাড়িয়া পূর্ব্ব-বঙ্গে যাইতে হইবে। আর আপনাকে কি লিখিব? ঈশ্বর আপনাকে অতুল সুখে সুখী করিয়া, আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ করুন।

ভূপেন্দ্রজিৎ সিংহ।

জুলিয়ানা ভূপেন্দ্রের পত্র পাঠ করিয়া, প্রথম পংক্তি দর্শনেই মনে মনে বলিল "ভূপেন্দ্র! যদি তুমি আমাকে 'আপনি' না লিখিতে, জীবনকে সফল জ্ঞান করিতাম।" জুলিয়ানা আবার পড়িতে লাগিল। যেখানে "এ নিস্বার্থ-উপকারে কেনা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারে" লেখা ছিল, তাহা পাঠ করিয়া, জুলিয়ানা মনে মনে বলিল "ভূপেন্দ্র আমার কোন স্বার্থ দেখিতে পায় না। ইহা ভিন্ন রমণী-হৃদয়ে আর অধিক কি

স্বার্থ আছে ?" পত্রের শেষ পংক্তি পাঠ করিয়া, জুলিয়ানা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিল "হে অন্তর্য্যামিন্! আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবার নয়; তবে এ অস্থির হৃদয়ে কি স্থৈর্য্য সম্পাদন করিবে না ?"

প্রিয় পাঠক! জুলিয়ানা কি নিস্বার্থ হইয়া, অপরিচিত শত্রু-যুবক ভূপেন্দ্রের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল ? এখন তুমি বুঝিতে পারিলে কোন্ স্বার্থ-তরঙ্গ জুলিয়ানার হৃদয়ে আঘাত করিতেছিল। স্বর্গের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু এ নশ্বর ভৌতিক জগতে, স্বার্থ যাহার পরিচালক নয়, এমন কোন কাজই দেখিতে পাওয়া যায় না। জুলিয়ানার ভালবাসা ভূপেন্দ্রের প্রতি চলিয়া গিয়াছে, বাঞ্ছিত বস্তুর কষ্ট দর্শনে মনে ব্যথা পাইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছে। ভূপেন্দ্রের পত্র পাইয়া তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। জুলিয়ানা জানিত, যে ক্ষত্রিয় জাতি ধর্ম্মলোপ-ভয়ে সমরে আপনাদিগকে আহুতি প্রদান করিয়াছে, সেই ক্ষত্রিয় যুবক ভূপেন্দ্রকে সে কখনো পাইতে পারে না। বিশেষতঃ ভূপেন্দ্র পরিণীত কি অপরিণীত তাহাও সে জানিত না। জুলিয়ানা ইহাও বুঝিল—হৃদয় যে প্রণয়স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহা হইতে আর সে তাহা ফিরাইতে পারিবে না; ভূপেন্দ্রকেও কোন মতে আশা করিতে পারে না। তথাপি মনে ভাবিল আর কিছু না হয় তাঁহাকে একবার দেখিয়া সুখী হইবে। দেখিয়া কি হইবে, পরেইবা কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, তাহা কিছুই ভাবিল না। ভূপেন্দ্রকে দেখিবে এবং গৃহে থাকিয়া হেরল্ডের সদ্ব্যবহারের অবমাননা করিবে না, ইহা স্থিরসঙ্কল্প করিল। হিন্দু মহিলাপেক্ষা ইউরোপীয় রমণীদিগের হৃদয়ে স্বাধীনতা অধিক পরিমাণে বিরাজমান; জুলিয়ানা অযোধ্যা ছাড়িয়া, ভূপেন্দ্র দর্শনে পূর্ব্বদেশে আসিবে বলিয়া বুক বাঁধিল। হেরল্ড প্রেমার্থী হইয়া নিজের প্রাণাপেক্ষাও তাহাকে অধিক ভালবাসেন, ইহা ভাবিতে তাহার দারুণ

কষ্ট হইল। কিন্তু সে কি করিবে? মত্তমাতঙ্গ-গতি ফিরান সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু যৌবনে মনের গতি ফিরান জুলিয়ানার নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। সে হেরল্ডের অজ্ঞাতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

-:০০০:-

উদাসীনের কুটীর।

এক দিন অপরাহ্নে এক খানা নৌকা আসিয়া লুমার ঘাটে পৌঁছিল। মাঝিরা এক প্রোথিত বংশখণ্ডের সহিত উহা দৃঢ় রূপে বদ্ধ করিলে পর, নৌকাগৃহ হইতে তান্তিয়া টোপী বাহির হইলেন; এবং এক জন ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বীরপাল, এক খানা শিবিকা অনুসন্ধান করিয়া লইয়া আইস।" বীরপাল "যে আজ্ঞা" বলিয়া বাহক ও শিবিকা সন্ধানার্থে চলিয়া গেল। মাঝিরা এই অবসরে বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিল; কেহ তামাক সেবনে নিযুক্ত হইল, কেহ ঘটিতে জল ভরিয়া নিতান্ত আগ্রহের সহিত পান করিতে আরম্ভ করিল; তাহাতে তাহাদের কণ্ঠ হইতে এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ বাহির হইয়া, সকলের কর্ণ তৃপ্ত করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে বীরপাল শিবিকা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ক্রমে ক্রমে সকলেই নৌকা হইতে অবতরণ করিলে পর, তান্তিয়া টোপী হেমপ্রভার হাত ধরিয়া তাহাকে তীরে আনিলেন। হেমপ্রভা শিবিকারূঢ়া হইলে, বাহকেরা উহা স্কন্ধে লইয়া,সুর তুলিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। গমনকারীরা কতক্ষণ অবিশ্রান্ত গমনের পর রাত্রি দেড় প্রহরের সময়

এক মন্দির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ, তন্মধ্যে যে, পুস্তক পাঠ হইতেছিল, বাহির হইতে তাহা শুনা যাইতেছে। তান্তিয়া টোপী দ্বারে আঘাত করিয়া বলিলেন "স্বামীজী, দ্বার খুলুন।" গৃহাভ্যন্তর হইতে গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল "কেও।"

তান্তিয়া। "আপনার দাস তান্তিয়া টোপী।" ব্রহ্মানন্দ স্বামী শ্বাপদ ভয়ে এইরূপ দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রায়ই ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিতেন, তান্তিয়া টোপীর আগমনে গাত্রোত্থান করিয়া, সহর্ষে দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিলেন "আসুন, আমি আপনার জন্য বড় চিন্তিত ছিলাম। আপনি যে বিপদসঙ্কুল কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাহাতে আপনার বন্ধুগণের চিন্তার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।"

তান্তিয়া। যদি দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারি, তবে ইহা হইতে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

ব্রহ্মা। "আপনার ন্যায় বীর এবং দেশহিতৈষীর মুখ হইতে অন্যরূপ বাক্য সম্ভবে না।" ব্রহ্মানন্দ স্বামী এতক্ষণ হেমপ্রভাকে দেখিতে পান নাই, তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কে ?"

তান্তিয়া। "আমি উন্মত্ত হইয়া যাহাদের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম, এ তাহার একটী—আমার সংসারের একমাত্র বন্ধন, অপরটী"—তান্তিয়া টোপী আর বলিতে পারিলেন না, নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত জল পড়িতে লাগিল। হেমপ্রভাও নীরবে কাঁদিল। ব্রহ্মানন্দ সকল বুঝিতে পারিলেন এবং একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন "বীরবর, আপনি বুদ্ধিমান, আপনাকে আর কি প্রবোধ দিব ?"

তান্তিয়া। "যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য এ হৃদয় দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়া থাকে, স্বামীজী, তাহা ক্ষমা করুন। আজ আপনার সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি এই দেহ এই বাহু ধরিতে সক্ষম থাকে, তবে

"এক দিন না এক দিন এই নরাধমদের উত্তপ্ত শোণিতে ভ্রাতৃশোক নির্ব্বাণ" করিব।" তিনি কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন "তান্তিয়া টোপীর চক্ষুজলই তাহার শোকের শান্তি নয়, যদি কিছুতে শান্তি থাকে তবে তাহা তাহার শত্রুর রক্তপাতে।" তাঁহার মুখভঙ্গি এবং ক্রোধ-প্রদীপ্ত নয়ন দেখিয়া স্বামীজী ভীত হইলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন, কেহ কোন কথা বলিতেসাহস করিলেন না। স্বামীজী পুনরার বলিলেন "আপনি পথভ্রমণে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন এখন কিঞ্চিৎ আহার করিয়া বিশ্রাম করুন।"

তান্তিয়া। আমি একমুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা নষ্ট করিতে পারি না। শুনিয়া থাকিবেন ঝান্সির রাণী ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, আমাকে এখন তাঁহার সাহায্যার্থে যাইতে হইবে। আযোধ্যা হইতেই ঝান্সি অভিমুখে রওনা হইতাম, কিন্তু হেমপ্রভা সঙ্গে, তাহাকে কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া না গেলে নিশ্চিন্ত থাকিত পারি না,সেইজন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার নিকট ইহাঁকে রাখিলে আমার কোন ভয় থাকিবে না।

ব্রহ্মা। হেমপ্রভার জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। অন্ততঃ অদ্য এখানে থাকিয়া গেলে ভাল হইত না? এখন রাত্রি কালে কোথায় যাইয়া কষ্ট পাইবেন।

তান্তিয়া। "আমি সঙ্গে নৌকা রাখিয়াছি, আর বিলম্ব করিতে পারি না। যদি কার্য্য সাধন করিতে পারি তবে পুনরায় আসিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব।" তিনি হেমপ্রভার প্রতি চাহিয়া বলিলেন "হেমপ্রভা,আপাততঃ তোমার পিতা হইতে বিচ্যুত হইলে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে অধিক দিন এ অবস্থায় থাকিতে হইবে না। বিশেষতঃ তোমাকে যাঁহার নিকট রাখিয়া গেলাম, তিনি তোমাকে পিতার অধিক স্নেহ করিবেন।"

হেম। পিতঃ! আপনি এরূপ অনুমতি করিবেন না। আমি আপনাকে ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পারিব না।

তান্তিয়া। নির্ব্বোধ বালিকা, যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে কি আমি তোমাকে অন্যস্থানে রাখিয়া যাইতাম? তোমার পিতার হৃদয় কি এত স্নেহহীন যে, একমাত্র কন্যাকে স্থানান্তর রাখিতে তাহার মর্ম্মান্তিক ক্লেশ হয় না? কিন্তু হেম, উপায় নাই। এখন আমাকে দিবা রাত্রি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় আমার সঙ্গে গেলে কে তোমার মুখপানে চাহিবে? কে তোমায় যত্ন করিবে?

হেম। বাবা, আমি বালিকা সত্য, কিন্তু আমি বীরাগ্রগণ্য তান্তিয়া টোপীর কন্যা। যাহার পিতা ক্লেশ ও বিপদকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া সংকল্প সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেকি প্রায় কাল্পনিক একটু অসুবিধা সহ্য করিতে সক্ষম হইবে না? আর কিছু না পারি, আপনার সঙ্গে থাকিলে অন্ততঃ আপনাকে পিপাসায় এক গ্লাস জল দিয়াও কন্যার কার্য্য করিতে পারিব।

তান্তিয়া। "হেমপ্রভা, জাননা তুমি কি কহিতেছ, এখন যে আমাদের পায় পায় বিপদ তাহা কি ভুলিয়াছ? আমার জন্য তুমি চিন্তা করিও না। যদি ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে লোপ না হইয়া থাকে, যদি সত্যের জয় হয়, তবে হেম, নিশ্চয়ই সকল বিপদ হইতে আমি রক্ষা পাইব, এবং অবিলম্বে তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সুখী হইতে পারিব। তুমি চিরকাল তোমার পিতার কার্য্য ও তাহার বুদ্ধির পক্ষপাতী, এখন কি অন্যরূপ হইবে?" এই বলিয়া হেমপ্রভাকে সান্ত্বনা বাক্যে অনেক বুঝাইয়া গমনোদ্যত হইলেন। হেমপ্রভা আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না, কেবল নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তান্তিয়া টোপী স্বামীজীর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া, মন্দির হইতে বাহির

হইলেন, এবং কতক দূর যাইয়া স্বামীজীকে পুনরায় ডাকিলেন। তিনি নিকটে গেলে পর বলিলেন "স্বামীজী, আমি অন্ধ নই, প্রতিমুহূর্ত্তেই যে, আমার মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা আমি জানি। যদি তাহাই হয়, তবে আমার হেমপ্রভাকে তাহার ইচ্ছানুরূপ একটি পাত্র অনুসন্ধান করিয়া বিবাহ দিবেন। কাণপুরে সুকলাল শ্রেষ্ঠীর নিকট আমার অনেক অর্থ গচ্ছিত আছে, আমার এই নিদর্শন দেখাইলেই সে তাহা দিবে।" এই বলিয়া, অঙ্গুলিস্থ অঙ্গুরীয় খুলিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন এবং পুনরায় অভিবাদন করিয়া নদী অভিমুখে চলিলেন। স্বামীজী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, হেমপ্রভা দ্বারে দাঁড়াইয়া সজল নয়নে গমনশীল পিতার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন "মা, তোমার পিতার সদৃশ বীরের জন্য কোন চিন্তা করিও না; আইস গৃহমধ্যে আসিয়া বিশ্রাম কর," এই বলিয়া তাহাকে মন্দির মধ্যে লইয়া গেলেন।

উদাসীনের যত্নে হেমপ্রভা অনেক সান্ত্বনা লাভ করিল এবং তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিল। যদি কেহ লক্ষ্য করিত, সে দেখিতে পাইত যখনই হেমপ্রভা একাকিনী থাকে, তখনই বসিয়া কি ভাবে এবং সময় সময় এত অন্যমনস্ক হয় যে, তাহাকে কেহ ডাকিলেও সহসা উত্তর পায় কি না সন্দেহ।

এক দিবস আহারান্তে উদাসীন শয়ন করিয়া আছেন, হেমপ্রভা পার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতেছে; সন্যাসী কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন "হেমপ্রভা, তোমরা এত দিন কিভাবে অবস্থান করিয়াছিলে, জানিতে বড় কৌতূহল হইতেছে।" হেমপ্রভার মনে গুরুজীর শোক উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া, উদাসীন এত দিন হেমপ্রভাকে এই সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। হেমপ্রভা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সমুদয় কথা তাঁহাকে বলিতে লাগিল। এই

সমস্ত কথা বলিবার সময় হেমপ্রভা ভূপেন্দ্রের নাম উল্লেখ না করিয়া, একজন ক্ষত্রিয় যুবক বলিয়া তাঁহাকে অভিহিত করিল।

ব্রহ্মা। "হেমপ্রভা, বার বার যে ক্ষত্রিয় যুবকের কথা বলিলে তাহার নাম কি?" হেমপ্রভা একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "ভূপেন্দ্রজিৎ সিংহ।" এই নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র উদাসীন চমকিয়া উঠিলেন; হেমপ্রভার দৃষ্টি নিম্ন দিকে ছিল বলিয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, তাহার পরিচয় জান?"

হেম। "শুনিয়াছি অযোধ্যার একজন ভূস্বামী—অজিৎ সিংহ তাঁহার পিতা; তিনি নাকি অনেক দিন পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।" উদাসীন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া একটুকু নীরব রহিলেন।

ব্রহ্মা। সে ভূপেন্দ্র এখন কোথায় আছে?

হেম। "তিনি এখন পূর্ব্ব বঙ্গের বিদ্রোহীদিগকে উত্তেজিত করিতে তথায় চলিয়া গিয়াছেন।" ব্রহ্মানন্দ স্বামী উঠিয়া গেলেন সে দিন আর কোন কথা হইল না।

—:o:—

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন মনক্ষোভ।

ভূপেন্দ্র অযোধ্যা ছাড়িয়া চলিলেন। পথে মাঝে মাঝে থামিয়া অনেক স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এক দিন অপরাহ্নে তিনি এক নির্জ্জন পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন; যাইতে যাইতে পথসম্মুখে এক পতিত শরীর দেখিতে পাইলেন। শীঘ্রগতিতে নিকটে যাইয়া

দেখেন, তাঁহার মুক্তিকারিণী জুলিয়ানা ক্ষতবিক্ষত কলেবরে ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে। পরিচ্ছদ সমূহ ছিন্নভিন্ন, সুগৌর শরীরের নানা স্থান হইতে রক্তস্রোত বহির্গত হইতেছে। চক্ষু নিমীলিত, শুষ্ক জিহ্বা জলপিপাসায় যেন এক একবার বহির্গত, আবার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। মুখভঙ্গী দেখিলেই জুলিয়ানা যে মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতেছিল, তাহা সহজে উপলব্ধি হয়। ভূপেন্দ্র কি করিবেন প্রথমতঃ তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। জুলিয়ানার দারুণ পিপাসা বুঝিতে পারিয়া, দৌড়িয়া ছুটিলেন এবং দেখিতে দেখিতে নিকটস্থ এক জলাশয় হইতে জল লইয়া আসিলেন। জুলিয়ানার মস্তক স্বকীয় ঊরুদেশে রাখিয়া, তাহার মুখে ফোটা ফোটা করিয়া জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। জুলিয়ানা কিঞ্চিৎ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া, নয়ন উন্মীলিত করিল। উন্মীলিত করিয়া যাহা দেখিল তাহাতে প্রথমতঃ বিশ্বাস হইল না, সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। একবার চক্ষু বুঝিয়া আবার দেখিল; এবার দেখিয়া বুঝিল, যাঁহার জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, যাঁহাকে দেখিবে বলিয়াই এ অচিন্তনীয় মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াছে, সেই ভূপেন্দ্র—সেই প্রাণাধিক ভূপেন্দ্র তাহার ব্যথিত মস্তক আপনার অঙ্কে রক্ষা করিতেছে। জুলিয়ানাকে নয়ন মেলিতে দেখিয়া, ভূপেন্দ্র দুঃখব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার এ দশা কে করিল ?" জুলিয়ানা ভূপেন্দ্রের মুখ পানে চাহিয়া রহিল, কথা বলিতে পারিল না। তিনি পুনরায় তাহার মুখে জল সিঞ্চন করিয়া কহিলেন "কোন্ পাপাত্মা পশু আপনার এ অবস্থা করিয়াছে ?" জুলিয়ানা অস্ফুট কাতর স্বরে উত্তর করিল "শত্রু।"

ভূপে। শত্রু কে ?

"বিদ্রোহী ক্ষত্রিয় সেনা।" ভূপেন্দ্র ললাটচর্ম্ম কুঞ্চিত

করিয়া বলিলেন "সে পাপীষ্ঠেরা কোথায় ?" জুলিয়ানা জল চাহিল; ভূপেন্দ্র জল প্রদান করিলে পর বলিল "বোধ হয় তাহারা অনেকদূর চলিয়া গিয়াছে।" ভূপেন্দ্রজিৎ সক্রোধে তরবারির বাটে হস্ত প্রদান করিলেন। ইচ্ছা দুরাত্মাদিগের পশ্চাতে এখনই ধাবিত হন; কিন্তু জুলিয়ানাকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়াই বা কি করিয়া যাইবেন? জুলিয়ানা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল। এ মৃত্যুসময়ে শত্রু নিহত হইলে তাহার কি লাভ? বরং ভূপেন্দ্র নিকটে থাকিলে, যতক্ষণ জীবন থাকিবে ততক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পারিবে, ইহা ভাবিয়া ধীরে ধীরে বলিল "এই সময় উহাদের অনুসরণ করিলে কি হইবে? ঈশ্বর উহাদিগকে ক্ষমা করুন।" ভূপেন্দ্র তরবারি ছাড়িয়া জুলিয়ানাকে বাতাস করিতে লাগিলেন; স্থিরদৃষ্টি জুলিয়ানা তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। ভূপেন্দ্রের বিষাদক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া বলিল "আপনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না, আমি সুখেই মরিতেছি, আমার মরণই মঙ্গল।" ভূপেন্দ্র কিছু বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন "আপনি কোথায় কি জন্য যাইতে ছিলেন?" জুলিয়ানার অধর প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল এবং বলিল "আমি কোথায় কি জন্য যাইতে ছিলাম? যাইতে ছিলাম স্বর্গে, স্বর্গ সুখের জন্য"—বলিতে বলিতে জুলিয়ানার মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল, মৃত্যুলক্ষণ স্পষ্ট দেখা গেল। ভূপেন্দ্র ত্রস্ততার সহিত শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ভূপেন্দ্রের মুখ সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে দেখিতে জুলিয়ানার ইন্দীবর তুল্য নয়নদ্বয় নিমীলিত হইল; প্রাণবায়ু ভূপেন্দ্রের কোলে রক্তাক্ত নবীন দেহ রাখিয়া বহির্গত হইয়া গেল। ভূপেন্দ্র সন্দেহ করিয়া তাহার নাশিকার নিকট হাত ধরিলেন; নিশ্বাস প্রশ্বাসের কোন লক্ষণ পাইলেন না। নাড়িয়া দেখিলেন, জুলিয়ানার সর্ব্ব শরীর নড়িয়া উঠিল। ভূপেন্দ্র

বুঝিলেন জুলিয়ানা এ সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে,—একটী গম্ভীর দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার হৃদয় হইতে আপনা আপনি বাহির হইল।

ভূপেন্দ্র জুলিয়ানার শোচনীয়মৃত্যু, তৎকর্ত্তৃক নিজের বন্ধন মুক্তি ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে কিছুকাল বসিয়া রহিলেন; পরে মৃত দেহের সৎকারাভিলাষে গাত্রোত্থান করিলেন। জুলিয়ানাকে রাখিয়া উঠিবার কালীন তাহার পরিচ্ছদ মধ্যে একখণ্ড লিখিত কাগজ দেখিতে পাইয়া তাহা তুলিয়া লইলেন। ভূপেন্দ্র পত্রের শিরোনামায় কারাধ্যক্ষ হেরন্ডের নাম দেখিতে পাইলেন। জুলিয়ানা আসিবার কালীন হেরন্ডকে এই পত্র লিখিয়াছিল, কিন্তু ভুলক্রমে তাহা সঙ্গেই রহিয়াছে। তিনি কৌতূহল পরবশ হইয়া পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন; জুলিয়ানা হেরন্ডের নিকট লিখিয়াছে,—

প্রিয় হেরন্ড! আমি বেশ জানি তুমি আমাকে তোমার জীবন অপেক্ষাও অধিক ভাল বাস। আমার ভালবাসা পাইলেই তুমি সুখী হইবে, এরূপ মনে কর। তুমি যে জাতীয় ভালবাসা আমা হইতে পাইতে ইচ্ছা কর, আমি তাহা দিতে পারি নাই। যাহা যিতে পারিয়াছি তাহা ভগিনীর ভালবাসা। মন আমার বাধ্য নয়, যে দিকে চলিয়া গিয়াছে তাহা হইতে ইহা কেমন করিয়া ফিরাইব? আমার হৃদয় কাহার প্রতি অনুরক্ত তাহা বলিয়া তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু নিজের অপরাধ নিজ মুখেই স্বীকার করিব, পার যদি ক্ষমা করিও। এক দিন যে ক্ষত্রিয় যুবককে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য তোমাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাহা কেবল দয়ায় বশবর্ত্তী হইয়া করি নাই। সে বিষয়ে তুমি আমার হৃদয়ের ভাব সম্বন্ধে প্রতারিত হইয়াছিলে; তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। সে বন্দী ক্ষত্রির যুবকের সহিত আমার কোন পরিচয় ছিল না; এখনও তাহার পরিচয় বিশেষ জানি না; তবে তাহার

দুঃখে এ হৃদয় কেন ব্যথিত হইল? হেরল্ড, আর তোমাকে ছলনা করিতে পারি না; তুমি শুনিলে অন্তরে বিষম ব্যথা পাইবে; সে ক্ষত্রিয় যুবক আমার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা। যে হৃদয় তোমার অকৃত্রিম ভাল বাসার বিনিময়েও তোমাকে দিতে পারি নাই; এক জন অপরিচিত যুবক কেবল মাত্র দর্শন দিয়াই তাহা অপহরণ করিয়াছে। ইহাতে আমাকে চপল এবং অপরিণামদর্শী ব্যতীত আর কি ভাবিবে? সে ক্ষত্রিয় যুবক বিবাহিত কি অবিবাহিত তাহাও আমি জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি, হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয় যুবক আমার বিজাতীয় জীবন কখনই গ্রহণ করিবে না। তবে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম কেন? তোমার গৃহে থাকিয়া, তোমার অপরিমিত ভালবাসার অপমান করিব না এবং একবার তাহাকে দেখিব—এই উদ্দেশেই গৃহ হইতে চলিলাম। তৎপর কি করিব জানি না, জানিতে ইচ্ছাও করি না। হেরল্ড, আমাকে ভুলিতে শিখিও। অকৃতজ্ঞ পাপীয়সীকে ভাবিয়া কষ্ট পাইবে কেন? চেষ্টা করিলে আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে গুণবতী ভার্য্যা পাইতে পারিবে। তোমার ন্যায় নির্ম্মল সরল চরিত্র ব্যক্তির উপযুক্ত স্ত্রী আমি হইতে পারি না। তোমার উপকারের প্রতিদান আমি কিছুই করিতে পারিলাম না আমি চলিলাম, জগদীশ্বর তোমার সুখ বর্দ্ধন করুন।

মঙ্গলাভিলাষিণী
জুলিয়ানা।

ভূপেন্দ্র জুলিয়ানার পত্র পাঠ করিয়া, নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয় এক বিষম তীব্র বিষ দাহনে দগ্ধ হইতে লাগিল। অবশেষে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "হতভাগিনি! দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, এ নবীন বয়সে কেন জীবন হারাইলে?" তাঁহার চক্ষে একফোঁটা জল দেখা দিল এবং গাত্রোত্থান করিয়া, উপযুক্ত স্থানে

লইয়া জুলিয়ানার মৃত দেহ সমাধিস্থ করিলেন। সে দিন হইতে ভূপেন্দ্র এক নূতন মনক্ষোভ লাভ করিলেন এবং তাহার পর হইতে তাঁহাকে আর কেহ অযোধ্যাতে দেখিতে পাইল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বৃক্ষতলে।

ভূপেন্দ্রজিৎ অনবরত পথ পর্য্যটন করিতে করিতে পূর্ব্ব বঙ্গে আসিয়া পৌঁছিলেন। ইচ্ছা ছিল কয়েক দিন ঢাকায় থাকিয়া, তথাকার শিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিবেন, কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই ঢাকার বিপ্লব মিটিয়া গিয়াছে। সেখানে কালা শিপাহী বিদ্রোহে অভ্যু-খান করিবে আশঙ্কায় তৎপূর্ব্বেই গোপনে ইউরোপীয় সৈন্য আনীত হয়। এক দিন প্রত্যুষে কোন শিপাহী দুর্গ তল বাহিনী বুড়ীগঙ্গা সলিলে অর্দ্ধাঙ্গ নিমজ্জিত করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে তর্পণ পাঠ করিতেছে; কেহ বা স্নানান্তে পূত হইয়া মুদিতনেত্রে দেবাদিদেব ভগবানের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে, কেহ বা উদয়োন্মুখ সূর্য্যের দিকে চাহিয়া তাহার স্তব করি-তেছে, কেহ দুর্গাভ্যন্তরে এখনও খাটিয়ার উপর সুখে শয়ান রহিয়াছে, এই রূপ নিশ্চিন্ত সময় ব্রিটিশ সৈন্য আসিয়া শিপাহীদিগকে লালবাগ নামক দুর্গে আক্রমণ করিল। শিপাহীদের কেহ এই ঘটনা পূর্ব্বে জানিতে পারে নাই; এখন সকলেই নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং ত্বরিত গতিতে আসিয়া আপন আপন বন্দুক গ্রহণ করিয়া, যতদূর সাধ্য জাতীয়

বল বিক্রমে বিপক্ষ দলের সহিত যুদ্ধ করিল। অবশেষে অনেকে রণভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল ও অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল।

ভূপেন্দ্রের উপস্থিতির পর ঢাকাতে কালা শিপাহীর নাম গন্ধও ছিল না। তিনি দেখিলেন এ দেশ বাঙ্গালী জাতির বাসস্থান, জগতে এমত উত্তেজনা নাই যাহাদ্বারা বাঙ্গালী জাতির জীবনকে উত্তেজিত করিতে পারা যায়। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে একতা এত বলবতী যে, এক গৃহবাসী কাহারও সহিত কাহারো প্রীতি আছে কি না সন্দেহ। তাঁহাদের দ্বারা দেশোদ্ধার চেষ্টা দূরে থাকুক বরং সুযোগ পাইয়া অনেকে এই সময় পলায়িত বিদ্রোহীদিগকে ধৃত করিয়া, গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিপন্ন হইয়া উঠিল। কেহ বা তাহাদের অনুসন্ধান বলিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মপ্রাপ্তে বাঙ্গালী জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদন করিল। এমন কি কতক গুলি দুষ্ট লোকের চক্রান্তে কতকগুলি নিরপরাধীও অপরাধী মধ্যে পরিগণিত হইয়া দণ্ডভোগ করিল। ভূপেন্দ্র ভাবিলেন ঢাকায় থাকিয়া কোন লাভ নাই, বরং তথায় থাকিলে বাঙ্গালী চক্রান্তে পড়িয়া তাঁহাকেও বিপদগ্রস্থ হইতে হইবে। তিনি অন্যত্র যাওয়াই স্থির করিলেন। তিনি শুনিলেন চাটিগাঁর বিদ্রোহী সেনা ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থান করিতেছে। তাহাদিগকে পুনরায় উত্তেজিত করিবার জন্য তিনি ঢাকা ত্যাগ করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে চলিলেন; এবং পদব্রজে হাটিতে হাটিতে ত্রিপুরা রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একদিন প্রচণ্ড রৌদ্রকিরণে হাটিয়া তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, পিপাসায় বুক শুকাইয়া গেল, বমনেচ্ছা হইল, আর চলিতে পারিলেন না, এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে প্রলাপ উপস্থিত; কতক্ষণ "হেমপ্রভা, অযোধ্যা, জুলিয়ানা, বধ্যভূমি" কি বকিলেন, বকিয়া অজ্ঞান হইয়া মৃত্তিকাশায়ী হইলেন। তাঁহার অচেতন দেহ

সমস্ত দিন বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিল, বৃক্ষ তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া সূর্য্যোত্তাপ হইতে তাঁহার শরীর রক্ষা করিল।

সূর্য্য যখন পৃথিবী হইতে সরিয়া যাইতেছিল; পশ্চিম গগন হাসিতেছিল, বিরহকাতরা সূর্য্যমুখী স্থির-নেত্রে প্রাণেশের পানে চাহিয়া রহিয়াছে; সেই প্রকৃতি বিচ্ছেদের সময় নিকটবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া, কয়েকজন প্রহরী বেষ্টিত হইয়া তিনখান শিবিকা যাইতেছিল। বাহকেরা সুর তুলিয়া চলিয়াছে, রক্ষকগণ লাঠি হস্তে অগ্রপশ্চাৎ যাইতেছে। অগ্রবর্ত্তী শিবিকা খানির দ্বার খোলা, দ্বাবিংশতি বর্ষীয় একটী যুবক মধ্যে বসিয়া পথপ্রান্তস্থ শোভা দেখিতেছেন। অন্য শিবিকাদ্বয়ের একখানার দ্বার সম্পূর্ণ আবদ্ধ, অপরখানার দ্বার ঈষদুন্মুক্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যবর্ত্তী আরোহী স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না; কিন্তু আমরা শিবিকার খুব নিকটে যাইয়া, বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিয়াছি, একটী পরমসুন্দরী যুবতী ঈষদুন্মুক্ত শিবিকা দ্বার পথে প্রাতঃ সূর্য্যের ন্যায় বিমল-রূপছটা ছড়াইয়া নিবিষ্ট মনে পথ দেখিতেছে। হঠাৎ একটী বৃক্ষের তলে তাহার দৃষ্টি ধাবিত হইল। বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক চাহিয়া দেখিল বৃক্ষতলে একটী মনুষ্য মৃতবৎ পড়িয়া আছে। তাহার কোমল হৃদয় আপন পর না ভাবিয়াই, এ দৃশ্যে গলিয়া গেল। সে মনে ভাবিল মৃত্তিকাশায়ী মনুষ্যটী এখনও জীবিত থাকিতে পারে। নিকটস্থ একজন পরিচারিকাকে ডাকিয়া যুবতী বলিল "তোমাদের বাবুকে পাল্কী নামাইয়া আমার কথা শুনিতে বল।" দাসী অমনি দ্রুতপদে যাইয়া শিবিকাস্থ যুবককে সংবাদ দিল। অগৌণেই বাহকদের স্কন্ধ হইতে শিবিকা ভূমিতে অবতরণ করিল। অনবরত শিবিকাবহনে বাহকগণের কাল শরীর হইতে এক অপূর্ব্ব রস বাহির হইয়া, তাহাদের রসিকতার পরিচয় দিতেছিল; তাহারা শিবিকা নামা-

ইয়া স্কন্ধস্থ গামোছা দ্বারা ক্ষরিত রস মুছিল এবং তাহা দ্বারাই শরীরে বাতাস করিতে লাগিল। যুবক শিবিকা সমীপে গেলেন, ঈষদুন্মুক্ত শিবিকা দ্বার আরো একটু উন্মুক্ত করিয়া, তন্মধ্যে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?" যুবতী অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বৃক্ষতলস্থ পতিত মনুষ্যকে দেখাইয়া বলিল "বোধ হয় লোকটী এখনও জীবিত আছে, হয়ত আমরা চেষ্টা করিলে উহাকে বাঁচাইতে পারিব।" যুবতীর কোমল-হৃদয় পরদুঃখে ব্যথিত দেখিয়া, যুবক মনে মনে তাহার প্রশংসা করি-লেন। একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "নিকটে কোন মনুষ্যাশ্রম নাই, সঙ্গেও অতিরিক্ত শিবিকা নাই, ইহাকে কেমন করিয়া লইয়া যাই? না লইয়া গেলেই বা পথিমধ্যে উহার কি করিতে পারি?"

যুবতী। "মা যে শিবিকাতে আছেন, আমি তাহাতেই যাইতে পারিব।" নিজের শিবিকা উল্লেখ করিয়া বলিল "এই শিবিকায় উহাকে উঠাইয়া লও।" যুবক শুনিয়া আরো সুখী হইলেন। তিনি মৃত্তিকাশায়ী ভূপেন্দ্রের নিকট যাইয়া দেখেন, একটী সুন্দর যুবক অচেতনাবস্থায় পড়িয়া আছে। তাঁহার ক্লান্ত ও দ্রুত নিশ্বাস প্রশ্বাস সশব্দে বহিতেছে, চক্ষু রক্তবর্ণ, নয়নতারা সঙ্কুচিত ও স্পন্দনহীন। তিনি হস্ত ধরিয়া দেখিলেন, শরীর নিতান্ত উষ্ণ এবং নাড়ী দুর্ব্বল ও এলোমেলো। যুবক যদ্যপিও চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া থাকুন কিন্তু তিনি সাধারণ অনেক রোগের প্রতীকার করিতে জানিতেন। এখন ভূপেন্দ্রের রোগের কারণ ও তাঁহার রোগ বুঝিতে পারিয়া, একজন ভৃত্যকে জল আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য জল আনিলে, তিনি উহা ভূপেন্দ্রের মস্তক ও চক্ষুতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রয়োগের পর ভূপেন্দ্র চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন; কিন্তু কথা কহিতে পারি-লেন না; মুখ ভঙ্গিতে দারুণ কষ্ট প্রকাশ করিলেন। যুবক তাঁহার

অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না; একজন ভৃত্যকে সেখানে রাখিয়া, নিজে শিবিকার নিকট আসিয়া বাহকদিগকে বলিলেন "শিবিকা লইয়া চল।" বাহকেরা অবসর পাইয়া প্রফুল্ল চিত্তে বিশ্রাম লাভ করিতেছিল; যুবককে নিকটে আসিতে দেখিয়া, বিমর্ষ ভাবে স্কন্ধে হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে আবার প্রস্তুত হইল। পূর্ব্বোক্ত যুবতী অন্য শিবিকার মধ্য হইতে তাহার মাতার শিবিকায় যাইবার জন্য যেমন এক খানা সুন্দর রাঙ্গা পা বাহির করিল, অমনি যুবক বলিলেন "তোমার আর এ শিবিকা হইতে নামিতে হইবে না, আমার শিবিকায়ই পথিককে তুলিয়া লইতেছি।"

যুবতী। তুমি হাটিয়া কষ্ট পাইবে? মা, আমি, দুজনে এক শিবিকায়ই যাইতে পারিব।

যুবক। "তাঁহার শরীর কাতর, দুজনে এক শিবিকায় গেলে তাঁহার কষ্ট হইবে। বাড়ীও নিকটে বইত নয়? এ অল্প পথ পর্য্যটনে আমার শরীরে কোন কষ্ট হইবে না। তুমি এই শিবিকায়ই অবস্থান কর।" যুবতী তাহার অর্দ্ধ বহিষ্কৃত শরীর পুনরায় শিবিকা মধ্যে লইয়া গেল এবং পূর্ব্ববৎ দ্বার রুদ্ধ করিল।

যুবক ভুপেন্দ্রকে আপনার শিবিকায় আরোহণ করাইলেন। বাহকগণ অনুমতি ক্রমে মুখ কাল করিয়া পুনরায় শিবিকা স্কন্ধে লইয়া চলিল। তিনি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ পদব্রজে হাটিয়া চলিলেন।

——:o:——

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রঘুপতির গৃহ।

ইংরেজ শাসনাধীন ত্রিপুরারাজ্যে ভুবনগঞ্জ নামে একটী গ্রাম আছে। সিদ্ধেশ্বরীনাম্নী এক কেদারবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন পর্ব্বত হইতে পার্ব্বত্য শীতল সলিল রাশি আনিয়া ভুবনগঞ্জের উত্তর প্রান্ত ধৌত করতঃ মেঘনা নদীতে অনবরত ঢালিতেছে। ভুবনগঞ্জ প্রসিদ্ধ পল্লীগ্রাম—রঘুপতি নামে এক জন বর্ম্মোপধারী ক্ষত্রিয়, ধনাঢ্য সেই গ্রামের জমিদার। কথিত আছে—যবন দস্যুর ভয়ে রঘুপতির পূর্ব্ব পুরুষ পাশ্চাত্য ভারত ছাড়িয়া, প্রাচ্য ভারতে আসিয়া বাস করেন। রঘুপতির পিতা ত্রিপুরা রাজ সরকারের কোন উচ্চ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া যান এবং সন্তান সন্ততির বাসের জন্য এক প্রকাণ্ড জাঁকাল বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের আখ্যায়িকার সময় বাড়ীর অবস্থা অনেক হীন হইয়া পড়িয়াছে। বাড়ীটী তিনমহল, অন্দর মহল বাড়ীর সর্ব্ব দক্ষিণে অবস্থিত, তৎপরে বৈঠক খানা মহল, বৈঠকখানা মহলের সম্মুখেই বাহির মহল—একটী পুষ্পোদ্যান লইয়া বসিয়া আছে। বাহির মহলের ফটক অতিক্রম করিয়া, এক প্রশস্ত পথ উত্তরাভিমুখে সিদ্ধেশ্বরী নদীর দিকে চলিয়া গিয়াছে।

বাড়ীর কর্ত্তা রঘুপতি বর্ম্মার একটী মাত্র পুত্র—নাম শশিশেখর। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র শশিশেখর ব্যতীত রঘুপতির সংসারে অন্য কোন আত্মীয় ছিল না; কেবল তাঁহার রক্ষিতা একটী বালিকা অদ্য চতুর্দ্দশবৎসর যাবৎ আপন মাতার সহিত তাঁহার গৃহে প্রতিপালিত

হইয়া আসিতেছে। বালিকার নাম গিরিবালা—নবযৌবনে পদার্পণ করিয়া, গিরিবালা দ্বিতীয় গিরিবালা রূপে রঘুপতির গৃহ-কাননে ফুটিয়া রহিয়াছিল। তাহার বিকশিত সৌন্দর্য্যরাশি যুবক শশিশেখরের ভবিষ্যৎ সুখের আশাস্থল। যুবক ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার সেই পার্থিব স্বর্গকে দেখিতেন, দেখিয়া মোহিত হইতেন।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, প্রহরী ও দাস দাসী বেষ্টিত তিন খানা শিবিকা আসিয়া রঘুপতির বাড়ীর ফটকে থামিল। শশিশেখর শিবিকার সঙ্গে আসিয়াছেন; তিনি শিবিকা মধ্যস্থ পীড়িত ভূপেন্দ্রকে বাহিরে আনিতে বলিলেন। একজন ভৃত্য তাঁহাকে কোলে করিয়া, এক গৃহ মধ্যে লইয়া গেল। অবশিষ্ট শিবিকা দ্বয় অন্দর মহলদ্বারে নীত হইল। বাহকেরা ঘাম মুছিয়া, তামাক সেবন করিতে বসিল। রক্ষকগণ আপন আপন আবাস গৃহে যাইয়া, পাগড়ী রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। বৃদ্ধ প্রহরী তেওয়ারি ঠাকুর একটু বিশ্রাম লাভ করিয়াই, ঘোটা হস্তে সিদ্ধি নিপীড়নে নিযুক্ত হইল।

পাঠক, একবার চলুন, আমরা রঘুপতির অন্দরে অনধিকার প্রবেশ করিয়া দেখি, পূর্ব্বোক্ত শিবিকাদ্বয় তদভিমুখে চলিয়া গেল কেন। ঐ দেখুন শিবিকা দুখানি থামিয়াছে; শিবিকা মধ্য হইতে গিরিবালা মেঘোন্মুক্ত শারদ শশীর ন্যায় রূপ রাশি ছড়াইয়া বাহির হইল। তাঁহার কুসুম সুকুমার দেহ এখন আমরা প্রকাশ্যরূপে দেখিতে পাইলাম। গিরিবালা নিজের পাল্কী হইতে নামিয়া, অন্য পাল্কীর নিকট যাইয়া, তাহার দ্বার উদঘাটন করিল। শরীরের উপরার্দ্ধ শিবিকা মধ্যে প্রবেশ করাইল; বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে রাশি রাশি কেশ কপোল বাহিয়া, গণ্ড বাহিয়া ঝুলিতে লাগিল। গিরিবালা মাকে বলিল "মা, উঠ, আমরা বাড়ী আসিয়াছি।" গিরির মাতা কাতরতায় নিদ্রা যাইতে ছিলেন, এখন

গাত্রোত্থান করিয়া বসিলেন। গিরি হাত ধরিয়া তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া এক গৃহে প্রবেশ করিল।

পাঠক মহাশয় হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শশিশেখর, গিরিবালা ও তাহার পীড়িতা মাতা কোথায় গিয়াছিলেন, এখনই বা কোথা হইতে আসিলেন। অদ্য চৌদ্দ পনর বৎসর যাবৎ গিরিবালার মাতার পীড়া; পীড়া বাহ্য দৃশ্যে কিছুই অনুভূত হইত না। দিন দিন অসুস্থতার বৃদ্ধি দেখিয়া দয়াবান রঘুপতি চিকিৎসক ডাকাইলেন। অনেক চিকিৎসক আসিয়া, তাঁহার রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করিলেন, কেহই কৃতকার্য্য হইলেন না। বালিকা গিরি, মাতার কষ্ট দেখিয়া বড় কাঁদিত; রঘুপতির কোমল হৃদয় ইহাতে আরো আর্দ্র হইল। তিনি নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে এক জন নাপিত কবিরাজ আনাইলেন। নাপিত বৈদ্য চিকিৎসা শাস্ত্রে যতদূর পণ্ডিত থাকুন আর না থাকুন, কপাল গুণে তাঁহার হাত যশটা বেশ ছিল। কবিরাজ মহাশয় শশিশেখরের সমভিব্যাহারে গিরিবালার মাতার শয্যা গৃহে প্রবেশ করিলেন; একবার বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক এপাশ ওপাশ চাহিয়া দেখিলেন; পরে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধারণবৎ রোগীর হস্ত ধারণে পরম গম্ভীর হইয়া বসিলেন। সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অভ্যস্ত না থাকুক, ধূর্ত্ততা তাঁহার বিশেষ অভ্যস্ত ছিল। কবিরাজ মহাশয় অক্ষর চিনিতেন; বাল্য কালেই শিশুবোধক আদিঅন্ত পাঠ করিয়া ছিলেন। চাণক্যের শ্লোক-সংগ্রহ তাঁহার বিশেষ রূপেই মুখস্থ ছিল। তিনি অর্দ্ধ স্পষ্ট অর্দ্ধ অস্পষ্ট, স্বরে একটী চাণক্য শ্লোক পাঠ করিলেন। রঘুপতি সংস্কৃত জানিতেন না; তিনি ভাবিলেন কবিরাজ বড় বিজ্ঞ। কবিরাজ শ্লোক পাঠ সমাপন করিয়া, রোগীর কেশ হইতে পদনখ পর্য্যন্ত শরীরের অবস্থা অতি বিশদরূপে অবারিত মুখে বলিতে

লাগিলেন। অধিকাংশই এধার ওধার ; ভাগ্যক্রমে কবিরাজের দুই এক কথার সঙ্গে রোগীর অবস্থা মিলিয়া গেল। কিন্তু তিনি মনে মনে বুঝিলেন রোগীর রোগ কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। একটা ব্যবস্থা না করিলে নয়, তিনি বলিলেন রোগীর বাত পিত্তে দ্বন্দ্ব হওয়াতে পিত্ত ঊর্দ্ধগামী হইয়া মাথায় উঠিয়াছে ; শ্লেষ্মা ও নীচগামী হইয়া রোগীকে নিতান্ত নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে। এই বলিয়া রোগীকে চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ব্যবস্থা করিলেন। রঘুপতিও তাঁহার ব্যবস্থা অনুমোদন করিলেন। তিনি উত্তরীয় বস্ত্র হইতে ঔষধের থলিয়া বাহির করিয়া, তবক স্বর্ণমণ্ডিত সাতটী পাকের বটিকা রঘুপতির হস্তে দিলেন। স্বর্ণ-মণ্ডিত বটিকার উপযুক্ত অনুপান দেওয়া কর্ত্তব্য বোধে, গোলাপ পুষ্পের রসই তাহার অনুপান ব্যবস্থা করিলেন। ঔষধের অপরূপ রূপদর্শনে উহার উপকারিতা সম্বন্ধে রঘুপতির কোন সন্দেহ রহিল না ; তিনি বাক্‌স হইতে পাঁচটী টাকা বাহির করিয়া, কবিরাজ মহাশয়ের হাতে দিলেন। কবিরাজ রঘুপতিকে একটী লম্বা চৌড়া নমস্কার করিয়া, মনে মনে নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

গিরিবালার মাতাকে ঔষধ সেবন করান হইল কিন্তু প্রতিকার কিছুই হইল না। তৎপর সহর হইতে একজন ডাক্তার আনীত হইলেন। ডাক্তার রোগীর অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া, বলিলেন "আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। হয় ত কোন মানসিক পীড়াই এই অসুস্থতার কারণ, ঔষধ সেবনে বোধ হয় কোন প্রতিকার হইবে না। তবে রোগীকে কিছু দিন জলবায়ু পরিবর্ত্তন উদ্দেশ্যে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া গেলে উপকার দর্শিতে পারে।" শেষোক্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থা মতে গিরিবালার মাতা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হইল ; গিরিবালা ও শশিশেখর পরিচর্য্যার্থে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। কিন্তু

যাঁহার অন্তর প্রদেশ গুপ্ত পীড়ায় পীড়িত, জলবায়ু পরিবর্ত্তন তাঁহার, রোগের কি উপশম করিবে? গিরিবালার মাতার কোন প্রতিকার হইল না; কাজেই শশিশেখর ও গিরিবালা তাঁহাকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গৃহ প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে পাঠক মহাশয়ের সহিত তাঁহাদের দেখা হইয়াছে।

ভূপেন্দ্র ভুবনগঞ্জ অনীত হইলে পর, তাঁহার পীড়া অধিক কাল রহিল না। এক সময় অচেতনাবস্থায় শয্যায় পড়িয়া আছেন; শশিশেখর ও গিরিবালা প্রাণপণে শুশ্রূষা করিতেছেন; হঠাৎ পীড়ার মোহে ভূপেন্দ্রের মুখ হইতে "হেমপ্রভা" এই নামটী বাহির হইল। গিরিবালা তাহা শুনিল; ভূপেন্দ্রকে মোহ প্রাপ্ত জানিয়া, কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না; কিন্তু তাহার মনে এক কৌতূহল রহিয়া গেল। শশিশেখর বুঝিলেন এ ব্যারামে চিকিৎসকের কোন আবশ্যকতা নাই। ইংরাজী ভাষায় এই রোগকে সান্‌ষ্ট্রোক্ (sunstroke) কহে। তাঁহার সুচিকিৎসায় ও যত্নে, গিরিবালার শুশ্রূষায় অল্প সময় মধ্যেই ভূপেন্দ্র সুস্থ হইয়া উঠিলেন। রঘুপতির গৃহে অবস্থান করিয়া, শশিশেখরের সহিত তাঁহার অত্যন্ত সৌহার্দ্দ জন্মিল।

গিরিবালার মাতা ভূপেন্দ্রের পরিচয় শুনিলেন; তাঁহার পীড়ার কোন উপশম না হইয়া উহা দিন দিন আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ভূপেন্দ্রকে দেখিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিত। গিরিবালার মাতা গিরিবালাকে একদিন গোপনে বলিলেন "গিরি, ভূপেন্দ্রকে তুমি দাদা বলিয়া ডাকিও"। গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিল "ভূপেন্দ্র কে, তাহা কি তুমি জান?" "সে পরিচয় তোমাকে সময়ান্তরে বলিব, অদ্য জিজ্ঞাসা করিও না," এই কথা বলিতে গিরিবালার মাতার চক্ষে জল দেখা দিল, মুখে বিষাদ চিহ্ন প্রকাশ পাইল। মাতার মনে কষ্ট হয় বুঝিয়া,

গিরিবালা তাঁহাকে আর কোন দিন ভূপেন্দ্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল না।

মা বলিয়া দিয়াছেন, গিরিবালাও সেই হইতে ভূপেন্দ্রকে দাদা বলিয়া ডাকিত। শুধু ডাকিত না, তাঁহাকে দাদা ভাবিয়া, সহোদরের ন্যায় ব্যবহার করিত। নির্ম্মলচরিত্র ভূপেন্দ্রও এ স্নেহ-সম্ভাষণে নিতান্ত সুখী হইলেন। প্রিয় পাঠক, যদি কোন সরলা সুন্দরী বালিকা সরল সম্ভাষণে তোমাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করে, তাহা হইলে তুমি কি সুখী হও না? ভূপেন্দ্র প্রথম দর্শনাবধি গিরিকে মনে মনে স্নেহ করিতে ছিলেন; এখন অধিকার পাইয়া, সেই স্নেহ প্রতিমাকে নিজের কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় ভাল বাসিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যৌবন বিকার।

প্রিয় পাঠক! আজ আপনার নিকট আমাদের একটী অনুরোধ আছে। অনুরোধটী এই—আখ্যায়িকা বর্ণিত ঘটনা সমূহের চৌদ্দ পনর বৎসর পূর্ব্বে অযোধ্যাতে অজিৎসিংহের বাড়ীতে যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল; যাহার সঙ্গে আমাদের আখ্যায়িকার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে, আপনাকে তাহা শুনিতে হইবে। ইহাতে আপনার ক্ষতি নাই; একটু ক্ষতি হইলেই বা কি? অনুরোধে কে না কি করে? অমুকে বড় লোক, তিনি অনুরোধ করিয়াছেন—তাঁহার শ্যালকের মাসীর ভগ্নীর পুত্রকে একটী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেসি দিতে হইবে। তিনি একজন গণ্ডমূর্খ হউন না কেন, তাহা

অপেক্ষা শত সহস্র গুণে উপযুক্ত কেহ কার্য্য প্রার্থী থাকুক না কেন, কার্য্যটী তাহাকেই দেওয়া হইল। তবে প্রশ্ন হইতে পারে আমরা বড় লোক নই, আমাদের অনুরোধের মূল্য কি? আমরা লোক যেমন সাধারণ, আমাদের অনুরোধটীও সেইরূপ সাধারণ। তবে শুনিবেন না কেন? ইহা ছাড়া একটী লাভও দেখাইয়া দিতেছি; যদি অনুগ্রহ করিয়া অনুরোধটী শোনেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন গিরিবালা ও তাহার মাতা কে; সংসার চক্রের কোন আবর্ত্তনে পড়িয়া, তাঁহারা রঘুপতির অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিলেন। পূর্ব্বে এক স্থানে বলা হইয়াছে অজিৎ সিংহ ভূপেন্দ্রের পিতা, তিনি অযোধ্যার একজন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। অজিৎ সিংহ সতর বৎসর বয়ক্রম কালে ভূপেন্দ্রের মাতার পাণিগ্রহণ করেন। ভূপেন্দ্রের মাতা তরঙ্গিণী এক ধনাঢ্যের কন্যা, বিবাহ-কালীন তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়স ছিল। তরঙ্গিণী বাহ্যদৃশ্যে যেরূপ সুন্দরী ছিলেন, অন্তর দৃশ্যে তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিলেন না। বিবাহের পর হইতে তরঙ্গিণী রূপগুণে স্বামীকে নিতান্ত বশীভূত করিয়াছিলেন। এরূপে কয়েক বৎসর চলিয়া গেল, ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রমে তরঙ্গিণী গর্ভবতী হইলেন। তাঁহার শ্বেতমুখ শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। ক্রমে ক্রমে গর্ভকালীন সমুদয় লক্ষণ আসিয়া, তাঁহাকে আশ্রয় করিল। দেখিতে দেখিতে দিন চলিয়া গেল, মাস চলিয়া গেল, অবশেষে যথা সময়ে তরঙ্গিণী এক সুন্দর কুমার প্রসব করিলেন। অজিৎ সিংহের গৃহ পরিজন বর্গের হর্ষ নিনাদে নিনাদিত হইতে লাগিল। হুলুধ্বনি ঘোমটা-মুখী যুবতীগণের মুখ হইতে ঘোমটা ফুরিয়া, অপরিচিত পুরুষদিগের পর্য্যন্ত কাণে পৌছিল। পুরোহিত ঠাকুর অন্দরমহলে বসিয়া স্বাভাবিক অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে জয়গীতা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাঝে মাঝে সময় বুঝিয়া, পরিচারিকাবর্গের প্রতি "আম্র পল্লব

কই! শিবমূর্ত্তিকাত দেখিতেছি না,কদলী লইয়া আইস," প্রভৃতি কতিপয় বর্ঠস্থ দুরূহ শব্দ প্রয়োগ করিয়া, নিজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশে নানা প্রকার আইন সঙ্গত আদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন। পরিচারিকাগণও জ্ঞানী পুরোহিত মহাশয়ের বাক্য অচিরে সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ হইল। অজিতের বাড়ী আনন্দময় হইয়া উঠিল। কিছু দিন পরে পুত্রের নামকরণ হইল—দেখিতে দেখিতে ভূপেন্দ্রজিৎ বিচরণক্ষম হইয়া সমবয়স্কদের সঙ্গে খেলায় যোগদান করিল।

বয়স ধর্ম্মেই হউক অথবা মনুষ্য-মনোবৃত্তির বক্রগতিতেই হউক, অজিৎ সিংহের সুন্দর স্বভাব কাল হইয়া উঠিল। অজিতের বাড়ীর উত্তরে অতি নিকটে একখানা ব্রাহ্মণ বাড়ী ছিল। বাড়ীর অধিকারী অজিতের অন্নে প্রতিপালিত। বাড়ীতে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, বৃদ্ধ কালের সহায় স্বরূপ তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া একটী বিধবা কন্যা ছিল। সুরবালা যখন স্বামী কি বুঝিতেন না, খেলার সামগ্রীকেই ভাল বাসিতে জানিতেন, তখন সেই কাঁচা সময়ে বাল্যবিবাহিতা সুরবালা বৈধব্যহার গলায় পরিলেন। সুরবালা কি তখন বুঝিতেন বিধবা হইলে কি হয়? যদি কেহ বলিত সুরবালা বিধবা হইয়াছে, বালিকা বুঝিতেন যে তিনি কোন ভাল কি মন্দ কার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য বক্তা তাঁহার প্রতি দোষারোপ কি গুণারোপ করিতেছে; বালিকা মুখ তুলিয়া তখন বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। সুরবালা যতই বড় হইতে লাগিলেন, বালিকা কালের শ্রুত 'বিধবা' শব্দের অর্থ ততই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। এখন বৈধব্য যন্ত্রণা প্রবলরূপে তাঁহার কোমল মনকে দগ্ধ করিতে লাগিল। লজ্জাশীলা সুরবালার সদা বিষণ্ণমুখ যদি কখনও দেখিতে—যদি দেখিতে একা থাকিলে তিনি কিরূপ ভাবেন আর কাঁদেন, তাহা হইলে, কেবল তাহা হইলেই হে পাঠক! তাঁহার হৃদয় যন্ত্রণার আভাস কথঞ্চিৎ পাইতে পারিতে।

এক দিন সান্ধ্য বাসন্তী বায়ু অজিতের হর্ম্ম্যোপরি মৃদু মৃদু বহিতে ছিল; অজিত ছাদে বসিয়া তাহা সেবন করিতেছেন। হস্তস্থ হুক্কা হইতে ধূম্ররাশি তাঁহার মুখ হইয়া, উত্তর দিকে চলিয়া যাইতেছিল। ধূম্রই যেন বলিয়া যাইতেছিল, "অজিৎ ছাদে বসিয়া আছেন।" হঠাৎ তাঁহার বাড়ীর নিকটস্থ পুর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ বাড়ীর এক প্রকোষ্ঠ গবাক্ষে একখানা সুন্দর মুখ ফুটিল। মুখাধিকারিণী অজিৎ সিংহকে দেখিতে পাইয়া, সলজ্জ মুখখানা ভিতরে লইয়া গেলেন। অজিৎ তাহা দেখিতে পাইলেন, তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, সুরবালারও সর্ব্বনাশের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল, ব্রাহ্মণের কুলে কলঙ্ক পড়িবার সুত্রপাত হইল। অজিৎ সিংহ অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া সে গবাক্ষের পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু সে চাঁদ আর সে আকাশে হাসিল না। তিনি ছাদ হইতে নীচে আসিয়া, সে মূর্ত্তির ধ্যান করিলেন; কিরূপে তাহাকে লাভ করিবেন তাহার উপায় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

তরঙ্গিণী কি সুরবালা হইতে কুৎসিতা ছিলেন? আমি বলি "না"। তবে অজিতের এদুর্ম্মতি কেন? কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা কি দিব পাঠক! যাও, তাহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, যে প্রাণাধিক প্রিয়তমার উর্ব্বসী জিনি চারুমুখের অপ্সরানিন্দিত মোহন আলাপন শ্রবণ করিয়া, আপনাকে ভুলিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রেয়সী-কপোলে শত শত চুম্বন করিয়াও তৃপ্ত হয় না; যদি সে মন খুলিয়া বলিতে সাহস পায়, সেও উত্তর করিবে "মনুষ্য হৃদয় দুর্ব্বল, কখন কখন প্রলোভনে বিচলিত হইতে পারে।" যাহার হৃদয় একেবারেই বিচলিত হয় না, সে স্বর্গের হৃদয় পাইয়াছে, সে হৃদয় হিমাদ্রি হইতেও অটল, তাহার সারের ইয়ত্তা নাই। কিন্তু বিচলিত হইলেই যে তাহাকে শাসন করিতে হইবে না, ইহা কে বলিতেছে? যে করে না সে পাষণ্ড, স্বর্গ ও পৃথি-

বীর শত্রু। যেরূপ কাননসুন্দর গোলাপ ফুটিয়া থাকিলে, কানন বিহারী সকলের নয়নই উহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ মানব-সৌন্দর্য্য ও লোকের মনকে আকর্ষণ করে। যাহার হৃদয় স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ, পাত্রানুসারে সে সৌন্দর্য্য তাহার মন হইতে ভক্তি, প্রীতি অথবা স্নেহ বাহির করিয়া আনে। কিন্তু যে হৃদয়ে সে ভাব নাই, তাহা রূপ হিল্লোলে দুলিতে থাকে, দুলিতে দুলিতে কোনটা ভাঙ্গিয়া পড়ে, কোনটা বা দোলে মাত্র, ভাঙ্গিতে পারে না। অজিতের হৃদয় এই হিল্লোলে দুলিতে দুলিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। অজিৎ সিংহ সুরবালার নিকট দিন দিন তাঁহার অভিপ্রায় জানাইতে লাগিলেন। সুরবালা তাহাতে অমত প্রকাশ করিলেন। সমাজ শাসনেই হউক অথবা প্রকৃত প্রদত্ত গুণেই হউক, ভারত-রমণী-হৃদয় ধৈর্য্যের আধার। রমণী হৃদয়ে ধৈর্য্য না থাকিলে সমাজে যে, কত অনিষ্ট ঘটিত কে বলিতে পারে? সে ধৈর্য্য বলেই সুরবালা মনের গতি বিরুদ্ধে ও তাঁহার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন বলিয়া কৃত সঙ্কল্প হইলেন। অজিৎ কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহার ছলনাময় পত্র প্রতিদিন সুরবালার হস্তগত হইতে লাগিল। সুরবালার সঙ্কল্প দূর হইয়া গেল, তাঁহার ভবিষ্যৎ চক্ষু অন্ধ হইল। অবশেষে যে প্রলোভনে পর্ব্বতারণ্য বিহারী দোর্দ্দণ্ড স্বাধীন করী করিণী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, দুর্ব্বল মনুষ্য হস্তের শতশত অঙ্কুশাঘাত অবনত মস্তকে সহ্য করে; যে প্রলোভনে পতঙ্গ আপন ভুলিয়া অনলে জীবন আহুতি দেয়; যে প্রলোভন ভবিষ্যতে অন্ধ করিয়া আপাত মধুর সম্ভাষণে সরল রমণী হৃদয়কে কুপথে চালিত করিয়া, বিপদ সলিলে নিমগ্ন করে; সেই প্রলোভন—সেই প্রলোভন মরীচিকা বালবিধবা সুরবালাকে ভুলাইল। সুরবালা অজিৎ সিংহের পাশব ক্রীড়ার পুতলী হইলেন। অজিৎ সিংহ মানব প্রকৃতির পরীক্ষা স্থল যৌবন ক্ষেত্রে নামিয়া পশু সাজিলেন।

যে দিবস প্রথমে সুরবালার কপাল পুড়িল, সে দিন রজনীতে গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া, সুরবালা অনেক ক্ষণ কাঁদিলেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবসন্ন হইলেন, শেষে একটু নিদ্রা আসিল। কিন্তু সে নিদ্রাও সুখের হইল না। সুরবালা একটী ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন যেন সতীত্বের প্রতিমূর্ত্তি স্বয়ং সতী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল "পাপীয়সি! আজি তুই দেবতা পূজ্য সতীত্ব রত্ন খোয়াইলি, স্ত্রীজাতির অবমাননা করিলি, তোর নরকেও স্থান হইবে না। যে কার্য্য আজ করিয়াছিস্, এখন সংসারে থাকিয়া তাহার ফলভোগ কর্, পশ্চাতে নরকে আসিয়া করিবি। ঐ দেখ্" এই বলিয়া তাঁহাকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশে এক দিক দেখাইয়া দিল। সুরবালা সে দিকে চাহিলেন, চাহিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর সে দিকে চাহিতে পারিলেন না, চীৎকার করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। জাগ্রত হইয়া ও কিছুকাল কাঁদিলেন, পরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহার কক্ষের নিকট যে, একটী কূপ ছিল তাহার নিকট গেলেন এবং তন্মধ্যে পতিত হইবার নিমিত্ত যেমন লম্ফ প্রদানে উদ্যত হইলেন, এমত সময় পশ্চাৎ দিক্ হইতে কে যেন আসিয়া ধরিল। সুরবালা চাহিয়া দেখিলেন অজিৎ সিংহ। তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন "অজিৎ, তুমি আমার মৃত্যু সময়ে কেন বাধা দিলে?"

অজিৎ। তুমি পাগল।

সুর। "যদি পাগল হইতে পারিতাম, তাহা হইলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতাম; তবে পাপ, পাপের ফল সকলই ভুলিতে পারিতাম", এই বলিতে বলিতে সুরবালা কাঁদিয়া ফেলিলেন। অজিৎ তাঁহার চক্ষু জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "সুরবালা, তোমার মনে এ যন্ত্রণা কেন? তুমি মরিতে চাহিতেছ কেন?"

সুর। আমি বাঁচিব কেন? এ পৃথিবীতে আমার কে আছে? শৈশবে মাতৃহীন এবং স্বামীহীন হইয়াছি। যাহা একমাত্র সতীত্ব ছিল, তাহাও অদ্য হারাইলাম। তবে আর কি লইয়া থাকিব? যখন একথা,—এপাপ কথা রাষ্ট্র হইবে, আমার পিতার তখন কিরূপ অবস্থা হইবে? আমি কি সমাজে মুখ দেখাইতে পারিব?

অজিৎ। "যদি আমাকে ভাল বাসাতে দোষ থাকে, সে দোষ কি তোমার? ঈশ্বর কেন তোমার স্বামীকে এত অল্প বয়সে অপহরণ করিলেন? সমাজ কেন তোমার সকল সুখের পথ বন্ধ করিয়া, তোমার জন্য এ দারুণ বৈধব্য ব্যবস্থা করিল? তবে সমাজ অতি হৃদয় হীন, সে কাহাকে দয়া করেনা, কাহার দুঃখ বোঝেনা। হয় ত আমাদের প্রণয় প্রকাশ হইলে, তোমাকে কিছু অবমাননা ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু প্রাণের সুরবালা, আমার ভালবাসা—যে ভালবাসা পৃথিবীতে কেহ কাহাকে দিতে পারে নাই, পারিবেনা, সেই ভালবাসার অনুরোধে কি সমাজের একটু অত্যাচার সহ্য করিতে পারিবে না? ইহা যে প্রকাশ পাইবে তাহাই বা কে বলিল?" পাপীষ্ঠ এই প্রকারে সুরবালাকে অনেক বুঝাইলেন, সুরবালার কুগ্রহ আসিয়া আবার স্কন্ধে চাপিল, তিনিও এক প্রকার এই রূপই বুঝিলেন।

তরঙ্গিণীর শয়ন শয্যায় আর অজিৎকে দেখা যাইতনা। দুই তিন দিন তরঙ্গিণী স্বামী চরিত্রে কোন সন্দেহ করিতে সাহস পাইলেন না। এখন বুঝিতে পারিলেন তাঁহার সুখাগারে চোর প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহার স্বামী সুখ ফুরাইয়াছে। হৃদয় হইতে প্রিয়তর স্বামী প্রতিদিন কোন গৃহে আকৃষ্ট হইতেন, হিন্দু গৃহপিঞ্জরাবদ্ধ তরঙ্গিণী তাহা কি রূপে জানিবেন? এক দিন নির্জ্জনে পাইয়া তরঙ্গিণী স্বামীর কর ধরিয়া বলিলেন "প্রাণেশ, হতভাগিনীর সুখ কেন ফুরাইল? বল, আর সহ্য করিতে পারি

না, আমি আর কাহার দিকে চাহিব ?" এই বলিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, অজিতের কপালে একটু বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইল। তরঙ্গিণী এখন বুঝিলেন এ মরুহৃদয়ে জল নাই, এই ব্যাধির ঔষধ নাই, অজিতের হাত ছাড়িয়া দিলেন। কর্কশ অজিৎ বিনা বাক্যে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তরঙ্গিণী নির্জ্জনে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলেন, প্রাণ প্রিয়তম ভূপেন্দ্রকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে কোলে লইয়া সে সরল বালকের চারু-মুখ দর্শনে অনেক কষ্ট ভুলিলেন।

তরঙ্গিণী যুবতী, যদিও এখন অপত্য স্নেহের আস্বাদন ভোগ করিতে ছিলেন, কিন্তু যে প্রণয় যৌবনে সংসারকে সুখময় করে এবং যুবক যুবতীর হাতে স্বর্গ তুলিয়া দেয়, সে প্রণয় স্রোত তখন ও তরঙ্গিণীর হৃদয়ে প্রবল রূপে বহিতেছিল। সরলা সতী এ আঘাত কি রূপে সহ্য করিবেন ? হৃদয় হইতে হৃদয় কাড়িয়া লইয়া, অন্যকে কি রূপে তাহা লইয়া খেলা করিতে দেখিবেন ? তরঙ্গিণীর সংসার তটিনীর সুখ সলিল দিন দিন শুকাইতে লাগিল। বিষাদ চিহ্ন হাসিকে সবলে মুখ হইতে তাড়াইয়া নিজের অধিকার বুঝিয়া লইল। প্রফুল্লতা চিরজীবনের তরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। চিন্তা চক্ষেরজল, দীর্ঘ নিশ্বাস প্রভৃতি সঙ্গীগণ সহ আসিয়া তরঙ্গিণীকে অন্তরে বাহিরে মলিন করিতে লাগিল।

এক দিন অজিৎসিংহ আহার করিতে বসিয়াছেন, তরঙ্গিণী আহার করাইতেছেন। তিনি আজি স্বামীকে ইচ্ছামত ভোজন করাইতে লাগিলেন। এসুখত তরঙ্গিণীর জীবনে আর হইবে না, অতি কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া, স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। মনে ভাবিলেন "আর দেখিব না, একবার জন্মের মত দেখিয়া লই।" আর হস্তে স্বামীর আহার্য্য যোগাইবেন না, আজি সেসুখের শেষ দিন। তরঙ্গিণী

আর কি ভাবিলেন ? ভাবিলেন, "আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব ! তুমি সুখে থাক, আমি চলিলাম।" স্বামীর আহার শেষ হইলে, তরঙ্গিণী প্রস্থান কালে অজিৎকে বার বার দেখিতে দেখিতে, মৃদু ভগ্ন স্বরে বলিয়া গেলেন "আমার পৃথিবীর স্বর্গ, প্রাণের ভূপেন্দ্রকে দেখিও।" সুরবালা-বিন্যস্ত-মানস অজিতের বধিরকর্ণ এ মর্ম্মঘাতী কথা শুনিল না। তরঙ্গিণীর স্বামীর নিকট শেষ বিদায় প্রার্থনা ভোজন প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে ও ভিত্তিতেই মিশিয়া গেল। পশু হইতে নিকৃষ্ট, পাষাণ হইতে কর্কশ অজিৎ সিংহ ভোজন সমাপনান্তে পশুবৃত্তির উপাসনা করিতে বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পাপের পরিণাম।

সেই দিন রজনীতে অজিতের গৃহে এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়া গেল ; কেহ তখন তাহা জানিল না। নিশিশেষে অজিৎ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া বৈঠকখানাতে শুইয়া রহিলেন। রজনী প্রভাত হইলে অজিৎ কোন কার্য্য সাধনার্থে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশ করিয়াই এক ভীষণ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন তরঙ্গিণীর সুন্দর দেহ দালানের কড়ি কাষ্ঠে ঝুলিতেছে। মুখ নীলিমাকার ধারণ করিয়াছে ; চক্ষু ঊর্দ্ধগত, জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বালক ভূপেন্দ্র এখন পর্য্যন্তও জানিতে পারে নাই, তাহার সর্ব্বস্বধন মা তাহাকে ছাড়িয়া পালাইয়াছেন। সে পালঙ্কোপরি ক্ষুদ্র বালিশে মস্তক রাখিয়া নিশ্চিন্তে

নিদ্রা যাইতেছে। বালকের শিয়রে একখানা পত্র, পত্রখানি মৃত্যুকালে তরঙ্গিণী স্বামীকে লিখিয়া গিয়াছেন। এদৃশ্য দেখিয়া অজিতের চক্ষে এক-বিন্দুও জল পড়িল না, স্তব্ধ হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় কতক্ষণ অচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে বালকের শিয়র হইতে পত্রখানা গ্রহণ করিয়া, ছন্নমতির ন্যায় দ্রুতপদে নীচ প্রকোষ্ঠে আসিয়া বসিলেন। কতক্ষণ উন্মনস্কে বসিয়া থাকিয়া পত্রখানা পড়িলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল।

"প্রাণনাথ! আমি বুঝিয়াছি আমার সমুদয় সুখ আশা ফুরাইয়া গিয়াছে। স্বর্গ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু তোমার মন—আমার মর্ত্ত্য জীবনের স্বর্গ তোমার ভালবাসা আমার পাওয়া অসম্ভব। আজি তোমাকে চোক্ ভরিয়া দেখিয়াছি, আজি তোমাকে স্বহস্তে আহার করাইয়াছি, আমি আমাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াই মরিলাম। আর এক কথা—তোমার স্বর্গীয় ভালবাসা হইতে যে, বঞ্চিত হইয়াছিলাম, সে আমার অদৃষ্টের দোষ অথবা পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপের কঠোর ফল, তোমার কিছুই দোষ নাই। কিন্তু প্রিয়তম, তুমি আমাকে অল্প বয়সেই যে অমূল্যরত্ন দিয়াছ, যে রত্নের মুখ দেখিয়া আমি এ অসহ্য যন্ত্রণাও কথঞ্চিত ভুলিতে পারিতাম, সেই রত্ন আজ মাতৃহীন হইল, তাহাকে দেখিও। আমার ভূপেন্দ্র মাতৃহীন হইয়াছে কিন্তু পিতৃ-হীন হয় নাই; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, শীঘ্র যেন না হয়। হতভাগিনীকে ভুলিয়াছিলে বলিয়া কি হতভাগিনীর সন্তানকেও ভুলিবে? তোমার সন্তান হয় ত তোমার ভালবাসায় কখনও বঞ্চিত হইবে না। আমি মরিলাম, আমার শান্তিলাভ হইল, কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে ঐ সরল বালকের কথা মনে করিয়া বড় কষ্ট পাইয়াছি। শিশু এখন নিশ্চিন্ত নিদ্রা যাই-তেছে, হতভাগিনী তাহাকে দেখিতে দেখিতেই মরিবে। তোমার নিকট

আমার অন্তিমকালের ভিক্ষা—নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া মাতৃহীন বালক যখন 'মাঁ, মা,' বলিয়া রোদন করিবে, তখন ইহাঁকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা করিও। আমি চলিলাম, তুমি সুখে থাক।”

পদাকাঙ্ক্ষিণী পাষাণী তরঙ্গিণী।

তরঙ্গিণীর পত্রদৃষ্টে ইহার অনেক স্থল জলধৌত বলিয়া বোধ হইতেছিল। পাঠক! হয়ত বুঝিতে পারিয়াছেন তরঙ্গিণী কাঁদিতে কাঁদিতে পত্র লিখিয়াছেন, চক্ষের জলে পত্র ভিজিয়া গিয়াছে। অজিৎ সিংহ তরঙ্গিণীর পত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্বমত বসিয়া রহিলেন। একজন দাসী নিকট দিয়া যাইতেছিল; সে অজিতের ভাবদৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিল “কি হইয়াছে?” অজিৎ কোন উত্তর করিলেন না। সে শয়ন কক্ষে আসিয়া এদৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বাড়ী শুদ্ধ সমুদয় লোকেই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইল। অজিৎ সিংহের বাড়ী আর্ত্তনাদে পূর্ণ হইয়া গেল। বালক ভূপেন্দ্র জাগ্রত হইয়া 'মা, মা, বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। শুভসম্বাদ অপেক্ষা কুসম্বাদ শীঘ্রগামী, দেখিতে দেখিতে নগর শুদ্ধ লোকে জানিতে পারিল অজিৎ সিংহের স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছেন।' চতুর্দ্দিকে ডাকাডাকি পড়িয়া গেল। বৃদ্ধারা মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, প্রৌঢ়ারা যুবতীদিগের নিকট ছেলে মেয়ে রাখিয়া, পালে পালে আসিয়া অজিতের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কোন বৃদ্ধা, যাহাকে পূর্ব্বে কোন দিনও অজিৎ সিংহের বাড়ীতে দেখা যায় নাই; একস্থানে বসিয়া চক্ষুমর্দ্দন করিতে করিতে চক্ষের জল বাহির করিতে লাগিল। কোন বৃদ্ধা তরঙ্গিণীর গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে শুষ্ক নয়নই অঞ্চল দ্বারা মুছিতে লাগিল। প্রৌঢ়ারা নানা প্রকার আক্ষেপ বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে দুই একফোঁটা চক্ষের জল অতি কষ্টে ছাড়িল। কোন শ্বেতাঙ্গিনী বা রগড়াইতে রগড়াইতে নাকের শ্লেষ্মা বাহির করিয়া,

নাকের রক্তিমাভা প্রকাশে দুঃখের অসাধারণ পরিচয় দিল। বেলা বাড়িতে আরম্ভ করিল, তরঙ্গিণীর মৃতদেহ সংকার করিবার জন্য শ্মশানক্ষেত্রে নীত হইল। অনাহুতা শোক কারিণীদের মধ্যে কেহ উদরজ্বালায়, কেহ প্রয়োজনীয় কার্য্যবশতঃ ক্রমশ অস্ত যাইতে আরম্ভ করিল।

অজিৎ সিংহ দ্বাররুদ্ধ করিয়া নিম্ন প্রকোষ্ঠে বসিয়া রহিলেন। কেহ যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে সাহস পাইল না। সমস্ত দিন রাত্রি এইরূপ ভাবে বসিয়া কাটাইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে সকলে দেখিল অজিৎ গৃহে নাই কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। অজিৎ সিংহ যাইবার কালীন ভূপেন্দ্রের এবং বিষয় ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার শ্যালকের নিকট পত্র লিখিয়া, তাহারই হস্তে অর্পণ করিয়া গেলেন। পত্রের একস্থানে লিখিত ছিল "আমার ন্যায় পাপাত্মার সংসারে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে, সংসারে থাকিলে আমার দ্বারা আরো সহস্র সহস্র বিষময় অনিষ্ঠ সংঘটিত হইতে পারে। যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া সাধ্বী পতিব্রতা তরঙ্গিণীর জীবন বিনাশ করিয়াছি, সেই অনুতাপে হৃদয়কে দগ্ধ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিলাম, আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। যত দিন জীবিত থাকিব, এ বহ্নি হৃদয়ে রাখিয়া ঈশ্বর চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিব।"

——:০:——

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ভিখারিণী।

তরঙ্গিণীর নাম পৃথিবী হইতে মিশিয়া গেল। তরঙ্গিণীর মৃত্যুর দিবস হইতে অজিৎ নিরুদ্দেশ হইলেন, কোথায় গেলেন কেহ জানিল না। ভূপেন্দ্র ভিন্ন তরঙ্গিণীকে এখন কে মনে করিবে? তরঙ্গিণীর জীবনাবসানের এক মাস পরে সুরবালার গোপন প্রণয়ের ফল বাহির হইল। সুরবালা অন্তঃসত্ত্বা, হিন্দুসমাজে তাঁহার মুখে চুনকালী পড়িবার উপক্রম হইল। ভবিষ্যতান্ধ হইয়া যাঁহাকে হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, এখন সে অজিৎ সিংহ গৃহে নাই, সুরবালা এসংবাদ কাহাকে বলিবেন? তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। কয়েক মাস তিনি তাঁহার কলঙ্ক ঢাকিয়া রাখিলেন, পরে বৃদ্ধ পিতা জানিতে পারিলেন তাঁহার বিধবা কন্যা গর্ভবতী হইয়াছে। বৃদ্ধের ক্রোধ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ক্রোধে ও অপমানে কাঁপিতে লাগিলেন। হতভাগিনী সুরবালাকে ডাকিয়া, হৃদয় বিদারক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কলঙ্কিনী, বল্ এপাপ কার্য্য কোথায় সম্পাদন করিলি? কাহাকে সহায় করিয়া এ পবিত্র কুলে কলঙ্ক লেপন করিলি?"

সুরবালা ব্রাহ্মণের কথায় কি উত্তর করিবেন? তাঁহার মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, মুখ শুকাইয়া গেল এবং ভীত ও কম্পিত কলেবরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে মর্ম্মান্তিক স্বরে বলিলেন "হে যম, আমাকে লও।" মৃত্তিকা বিদীর্ণ হইয়া যদি তখন তাঁহাকে গ্রাস করিত, তাহা হইলে তিনি কিছু সুখী হইতেন।

ব্রাহ্ম। চুপ করিয়া রহিলি যে? শীঘ্র বল্ কোন পাপাত্মা গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

সুরবালা চুপ করিয়া রহিলেন, হতভাগিনীর চক্ষু হইতে দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। গোরা ব্রাহ্মণ আবারও বলিলেন "পাপীয়সি! তুই জানিস্, আমি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি; কিন্তু হিন্দুসমাজ, হিন্দুধর্ম্ম আমার ত্যজ্য নয়। আমার গৃহ হইতে এখনই বাহির হইয়া যা। এগৃহে তোর স্থান হইতে পারে না।" সুরবালা কাঁদিয়া পিতার পদতলে পড়িলেন। পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ! আমাকে বধ কর, আমি একলঙ্ক লইয়া কোথায় যাইব?"

ব্রাহ্ম। "যথায় ইচ্ছা, তুই অস্পৃশ্যা। তোর পৃথিবীতে কেহ নাই, গৃহ হইতে বাহির হইয়া পাপের ফল ভোগ কর্‌গে।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সুরবালার মাথা ঘুরিয়া গেল, জগৎ আঁধার দেখিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া অমনি ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। মা পূর্ব্বেই মরিয়াছেন, সুরবালাকে এখন কে সান্ত্বনা করিবে? সমস্ত দিন বসিয়া বসিয়া কাঁদিলেন; নির্দ্দয় পিতা একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না। সুরবালা ভাবিয়া ভাবিয়া গৃহত্যাগই স্থির করিলেন।

রজনী যখন দ্বিতীয় প্রহর, সমস্ত জীব নিদ্রিত, পাপকার্য্যের সহচর অন্ধকার পাপী ভিন্ন সমস্ত জগতের চক্ষু ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তখন সেই নিস্তব্ধ সময়, অভিমান, লজ্জা ও দারুণ মনোবেদনা সুরবালাকে গৃহের বাহির করিল। বাহিরে আসিয়া পৃথিবীর এই ভীষণ দৃশ্য দর্শনে সুরবালার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না, কতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া কাঁদিলেন। অভিমান আর সুরবালাকে বিলম্ব করিতে দিল না, তিনি আপনাপনি বলিলেন "আমি

মরিব, এখন মৃত্যুই আমার পক্ষে শান্তি।” এই বলিয়া অন্ধকার ভেদ করিয়া সুরবালা অলক্ষ্যে দ্রুত পদে হাঁটিতে লাগিলেন।

মনুষ্য যদি পরিণামে অন্ধ না হইত, অদৃষ্ট লিপি যদি স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাইত, তবে সংসার চক্রের দুঃখ আবর্ত্তনের নিম্নে পড়িয়া কাহাকেও চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে হইত না। সুরবালা যদি জানিতেন, এ প্রণয় তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা করিবে, সমাজে সকলের নিকট ঘৃণনীয় করিবে, তবে হতভাগিনী কখনও অজিৎ সিংহকে আত্মসমর্পণ করিতেন না। দারুণ বৈধব্য বহ্নি বুকে ধরিয়া, অহরহ দগ্ধ হইতেন, তথাপি এ বিষ-প্রণয়পথে পা বাড়াইতেন না।

সুরবালা লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে করিতে, কেশবপুর নামক একটী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানে একটী কুটীরে অবস্থান করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহার্থে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। ভিখারিণীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া লোকে নানা সন্দেহ করিত এবং কৌতূহল পরবশ হইয়া, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিত। সুরবালা প্রকৃত উত্তর কিছু করিতেন না, কেবল বলিতেন “আমি ভিখারিণী, ভিখারিণীর পরিচয়ে আপনাদের কি হইবে?” সময় সময় তাঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কাঁদিতেন, আর কেহ কিছু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত না। কিছু দিন পরে উপযুক্ত সময়ে সুরবালা এক কন্যা প্রসব করিলেন। লোকে জানিতে পারিল ভিখারিণীর মেয়ে হইয়াছে; চারি দিক হইতে লোক আসিয়া ভিখারিণীর কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। সুরবালা ভদ্রকন্যা, ভাগ্য দোষে যৌবনেই ভিখারিণী সাজিয়াছেন, লোকের এই ব্যবহারে তিনি লজ্জায়, দুঃখে মরার ন্যায় হইয়া পড়িলেন। প্রসবের পর স্ত্রীলোকদিগকে সচরাচর যে ব্যারামে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়, সুরবালার ও সেই ব্যারাম উপস্থিত হইল। নিজের আহার বালিকার

আহার সংগ্রহ করিতে অশক্ত হইয়া পড়িলেন। সুরবালা জানিতেন কাশীতে অনেক লোক ভিখারীদিগকে সাহায্য করে। কেশব পুরে অবস্থান সুরবালার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল; তিনি সে স্থান ছাড়িয়া, দুগ্ধপোষ্য বালিকাটীকে বক্ষে লইয়া, রোগ-কাতর-পদ-বিক্ষেপে ধীরে ধীরে কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার সময় আর চলিতে না পারিয়া, এক নদীরতীরে, আসিয়া বসিয়া পড়িলেন, চক্ষে চতুর্দ্দিক আঁধার দেখিতে লাগিলেন। পাপের যে মোহন মূর্ত্তি সুরবালাকে ভুলাইয়াছিল; অঙ্গুলি হেলাইয়া সুমধুর বচনে আপাত মনোহর সুখ সম্রাজ্য দেখাইয়া দিয়াছিল; এখন আর তাহার সে মূর্ত্তি নাই; এখন সে মূর্ত্তি ভীষণ বিকট দর্শন। সুরবালা মানস নেত্রে তাহা দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ভীত হইলেন। কে যেন আবার হৃদয় হইতে বলিতে লাগিল; "পাপিয়সি! যখন জানিলি অজিৎ সিংহ স্বর্গীয় কামিনী তরঙ্গিণীকে তুচ্ছ করিয়া, তোকে প্রাণ দিতে চাহিতেছে, তখন কেন তাহাকে বিশ্বাস করিলি?" আত্মগ্লানি যেন একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ব্যঙ্গোক্তিতে বলিতেছিল "হতভাগিনি! তুই কি জান্‌তিস্ না তুই বিধবা, হিন্দু সমাজে থাকিয়া, কাহাকেও প্রাণ সমর্পণ করিবার তোর অধিকার নাই, করিলে তাহার ফল বিষময় হইয়া দাঁড়াইবে।" সুরবালার যেন বুদ্ধি লোপ হইয়া গেল, পাপের জ্বালা সহস্র সহস্র বৃশ্চিকবৎ তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। নিজের অদৃষ্টের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, মুকুর প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহার কার্য্যফল যেন তাহাতে ঝলসিতেছে। বালিকা একধারে পড়িয়া কাঁদিতেছে, সুরবালার আত্মবিস্মৃতি হইয়াছে, তিনি বালিকার ক্রন্দন শুনিতেছেন না। যে স্নেহ রমণী হৃদয়ের প্রধান পদার্থ, যে স্নেহবশে বালক বালিকা দেখিলে রমণী হৃদয় গলিয়া যায়, কিছু ক্ষণ পরে সেই স্নেহ সুরবালাকে বালিকা দেখাইয়া দিল। সুরবালা

অমনি আপন কষ্ট ভুলিয়া বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন আকাশে বিহার করিয়া সুরবালার কষ্ট দেখিল। তাহার হৃদয়ে একটুও দুঃখ হইল না; বরং সুরবালার মুখ আর দেখিবে না বলিয়াই যেন, সক্রোধে অস্তগিরিগুহায় চলিয়া গেল। রোরুদ্যমানা বালিকাকে দেখিয়া, বিহঙ্গমগণের আপনাপন শাবকদিগকে মনে পড়িল; অমনি সত্বর পক্ষে স্ব স্ব কুলায় চলিয়া গেল।

রঘুপতি বর্ম্মা তীর্থ পর্য্যটন মানসে নৌকায় পশ্চিম যাইতেছিলেন। তিনি নদীতীরে উপবিষ্টা বালিকাক্রোড়া রোরুদ্যমানা সুরবালাকে দেখিতে পাইলেন। সুরবালার কষ্ট দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদয় হইল। তিনি নৌকা লাগাইয়া তীরে উঠিয়া বলিলেন "বৎসে! তুমি কে? এখানে একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেছ?" সুরবালা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, কেবল চক্ষু হইতে অধিকতর বেগে জল পড়িতে লাগিল।

রঘু। তোমার পরিচয় আমাকে বল, যদি আমার দ্বারা কোন উপকার সম্ভবে তাহা অবশ্য করিব।

সুর। এ পৃথিবীতে আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই, আপনি আমার উপকার করিবেন? আমি নিজের জন্য বলিতেছি না, আমার কষ্ট আমি অল্পক্ষণেই শেষ করিতে পারিতাম, কিন্তু আমি না থাকিলে এ বালিকার কি হইবে, সেই চিন্তাতেই এত দিন মরিতে পারি নাই।

রঘু। "এ বালিকার পিতার নাম কি? তিনি কি জীবিত আছেন?" সুরবালা কাঁদিতে লাগিলেন। রঘুপতি দেখিলেন এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহার মনে নিতান্ত কষ্ট হইতেছে; তিনি একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা তিনি কোন্ জাতি?"

সুর। ক্ষত্রিয়।

রঘু। যদি তোমাকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই তুমি যাইবে?

সুর। "আপনি আমাকে এত অনুগ্রহ করিবেন ?"

রঘুপতি সুরবালার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন এবং পশ্চিম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালীন বাড়ী লইয়া আসিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়া টোপীর পত্র।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী নিজ গৃহের বারেন্দার উপর বসিয়া ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিতেছেন, হেমপ্রভা নিকটে বসিয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহা শুনিতেছে। বারেন্দার সম্মুখে ছোট ছোট কয়েকটী বৃক্ষ, বৃক্ষাবলীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। সন্ধ্যা সমীরণে নীচে ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জল উপরে বৃক্ষশির নড়িতে ছিল। সূর্য্য আর এখন আকাশে নাই, আলো ক্রমে হীন হইয়া আসিল। ব্রহ্মানন্দ আর পুস্তক পাঠ করিতে পারিলেন না; পাঠ সমাপন করিয়া বাসস্থানের চতুঃসীমায় সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইলেন। হেমপ্রভা বারেন্দার ভিত্তিতে বসিয়া প্রকৃতি সুন্দরীর সন্ধ্যা সজ্জা দেখিতে লাগিল। কোন বৃক্ষের শাখায় পাখীগণ বসিয়া, সায়ং কালীন রব করিতেছে; কোন বৃক্ষ পাখীত্যক্ত হইয়া আপনা আপনি সর্ সর্ করিতেছে। হেমপ্রভা কোন সময় আকাশের দিকে চাহিতেছে; কোন সময় পক্ষিরব শুনিতেছে; কোন সময় বা আপন মনে চিন্তা করিতেছে। সন্ধ্যা-সৌন্দর্য্য দর্শনে হেমপ্রভার কোমল মন গলিয়া গেল, সে গাইতে লাগিল।

কেন আজি কাঁদেরে পরাণ?
হৃদয় লাগিছে যেন শ্মশান সমান।
তুমি ত দিনেশ চলিলে সুদূরে, ভাসায়ে প্রকৃতি আঁধার সাগরে,
আবার আসিবে, আবার হাসিবে প্রকৃতি বিষাদ-বয়ান॥
যদিও নলিনী মলিন বদনে, রহিল একাকী বিরহ জীবনে,
পুন প্রিয় প্রাণ পতি দরশনে এ দুঃখ হবে অবসান॥
এছার অসার হৃদয় আগারে, ঘেরিয়াছে যেই বিষাদ তিমিরে,
কখন ঘুচিবে, কখন উদিবে আমার সুখের তপন॥

হেমপ্রভার কোমল কণ্ঠস্বর বৃক্ষগণের মধ্যে বাজিয়া উঠিল; ব্রহ্মানন্দ দূরে থাকিয়া তাহা শুনিলেন। বালিকার গান থামিয়া গেল, বৃক্ষাবলী মাথা নাড়িয়া যেন বলিল "গান ক্ষান্ত করিতে পারিবেনা।" ব্রহ্মানন্দকে আসিতে দেখিয়া বালিকা আর গাইতে পারিল না, গাত্রোত্থান করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। ব্রহ্মানন্দ একবার মন্দির পার্শ্বে আসিয়া, সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন মানসে পুনরায় পুষ্করিণী তীরে চলিলেন। হেমপ্রভাও গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া আলো জ্বালিল এবং স্বামীজীর আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদনোপযোগী দ্রব্য সকল যথা স্থানে আনিয়া রাখিল। স্বামীজীর সন্ধ্যোপাসনা সম্পাদন করিয়া আসিতে চন্দ্রোদয় হইল; সমস্ত দিক ফর্সা হইয়া উঠিল; তিনি বারেন্দার ভিত্তিতে বসিয়া পুনরায় ধ্যানমগ্ন হইলেন।

কতক্ষণ পরে এক জন লোক আসিয়া ত্বরিত গতিতে স্বামীজীর বাস স্থানের নিকট উপস্থিত হইল। আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "স্বামীজী,

ঘরে আছেন ?” ব্রহ্মানন্দ স্বামী চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন. বীরপাল আসিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “কি বীরপাল, অসময়ে কোথা হইতে আসিলে ?” বীর পাল উত্তর করিল “প্রভু তান্তিয়া টোপীর পত্র লইয়া আসিয়াছি।”

ব্রহ্ম। “তাঁহার মঙ্গল ত ?” বীরপাল চুপ করিয়া রহিল, স্বামীজী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন “কি ! উত্তর দিতেছ না যে ?”

বীর। “তাঁহার পত্র পাঠ করুন” এই বলিয়া একখানা পত্র স্বামীজীর হাতে দিল, স্বামীজী বীরপালকে বলিলেন “আইস” এই বলিয়া গৃহ মধ্যে যাইয়া দীপালোকে পত্র পড়িতে লাগিলেন; হেমপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, “পিতঃ ! পত্র কে লিখিয়াছে ?”

ব্রহ্মা। “তোমার পিতা।” হেমপ্রভা চঞ্চল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল “বাবা কি লিখিয়াছেন ?” স্বামীজী পত্র পড়িতে লাগিলেন।

আর্য্য ! শ্রীচরণ নিকট হইতে ঝান্সি আসিয়া এ দাস রাজ্ঞীর যথাসাধ্য সাহায্য করে। রাজ্ঞীও স্বয়ং অসাধারণ রণদক্ষতার সহিত বিপক্ষ দলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ভারতে বীর নারীর প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন। ফিরিঙ্গী জানিয়াছে, জগত জানিয়াছে, ভারত কেবল সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্নই প্রসব করে না, সর্ব্বোৎকৃষ্ট রমণীও প্রসব করে। যত দিন ইতিহাস পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হইবে, তত দিন ইংরাজগণ ঝান্সি-অধিশ্বরীর পরাক্রম ভুলিতে পারিবে না। কিন্তু হায় ! ভারতে বোধ হয় আর স্বাধীন পতাকা উড়িবে না। বিধাতারই ইচ্ছা হইয়াছে, ভারত দাসত্ব শৃঙ্খল পরিয়া বিধর্ম্মী শত্রুর দাস হইয়া থাকুক। ঝান্সির রাণী পরাজিত হইলেন; তাঁহার গৌরব সূর্য্যের সহিত জীবন-সূর্য্যও অস্তাচলে গমন করিয়াছে। ইংরাজগণ আসিয়া সবলে ঝান্সি অধিকার করিয়াছে। আমাকে ধৃত করাই এখন উহাদের প্রধান লক্ষ্য। এজন্য স্থানে

স্থানে লোক প্রেরিত হইয়াছে। এবার বোধ হয় শত্রুহস্ত হইতে আর রক্ষা পাইতে পারিব না। হেমপ্রভাকে এসংবাদ শুনাইবেন না; শুনিলে সে বড় কাতর হইবে। আপনি আমার পত্র পাওয়া মাত্র হেমপ্রভাকে লইয়া পূর্ব্ববঙ্গে রওনা হইবেন। আর এক মুহূর্ত্তও লুমাতে অবস্থান করিবেন না। যদি ইতিমধ্যে শত্রুহস্তে পতিত না হই, তবে সত্বরই চন্দ্রনাথ যাইয়া আপনার সহিত মিলিত হইব। আপনি আপাততঃ চন্দ্রনাথ যাইয়া কয়েকদিন অবস্থান করিবেন। আমাকে পূর্ব্বদেশের কোন গোপন স্থানে যাইয়া লুক্কায়িত ভাবে থাকিতে হইবে। চট্টগ্রামে এখান হইতে গোপনে পত্র গিয়াছে; যদি সেস্থানে শিপাহী বিদ্রোহ অভ্যুত্থান করে, তাহাদের সহিত যোগদান করার বাসনা আছে; নহিলে আসামে কামক্ষা প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়াই অবস্থান করিব। আপনি চন্দ্রনাথে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া, কামক্ষ্যা যাত্রা করিবেন। কামক্ষ্যাতে আমার সাক্ষাৎ না পাইলে জানিবেন, তান্তিয়া টোপী আর পৃথিবীতে নাই।—

শ্রীচরণাভিলাষী—

তান্তিয়া টোপী।"

হেমপ্রভা পত্র শুনিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং "বাবা আর বুঝি আপনাকে দেখিতে পাইব না" এইরূপ নানা প্রকার আক্ষেপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। স্বামীজী কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, বলিলেন "হেমপ্রভা, উতলা হইও না, অবোধের ন্যায় কেন অমঙ্গল কান্না কাঁদিতেছ? মা! তোমার পিতা ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য এ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন, অবশ্য ধর্ম্ম তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।" উদাসীন এইরূপে হেমপ্রভাকে বুঝাইলেন, কিন্তু হেমপ্রভার মন বুঝিল না, অবিশ্রান্ত চক্ষুজলে কপোলদ্বয় ভিজিতে লাগিল।

ব্রহ্মা। "মা, এরূপ অমঙ্গল চিন্তা করিও না, এখন একটু শান্ত হও। যাহাতে তোমার পিতার অভিমতে কার্য্য করিতে পারি, তজ্জন্য প্রস্তুত হও।" হেমপ্রভা অনেকক্ষণ কাঁদিল, পরে স্বামীজীর প্রযত্নে একটু স্থির হইল। তাহার পরদিনই লুমা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া স্থির হইল। ব্রহ্মানন্দ হেমপ্রভাকে আহার করিতে বলিলেন, হেমপ্রভা আহার করিল না, উভয়েই অনাহারে যাইয়া শুইয়া রহিলেন। ব্রহ্মানন্দ বন্ধুর বিপদ্ ভাবিয়া নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। হেমপ্রভা, একবার ভাবিল, "যদি কাকা জীবিত থাকিতেন, তবে এই সময় বাবার কত সাহায্য হইত; কিন্তু বিধাতা সে পথেও কাঁটা দিয়াছেন।" হেমপ্রভা নীরবে কাঁদিতে লাগিল। আবার ভাবিল, ভূপেন্দ্র সম্মুখে থাকিলে তাঁহাকে পিতার সাহায্যার্থে যাইতে অনুরোধ করিত, কিন্তু ভূপেন্দ্রেরই বা কি হইয়াছে, তিনিও জীবিত আছেন কি না, হেমপ্রভা ইহা ভাবিয়া অধিকতর অধীরা হইল। এবার হেমপ্রভা কাঁদিল না, তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িল না, কিন্তু অন্তর হুহু করিয়া দগ্ধ হইতে লাগিল। পিতার বিপদ বার্ত্তা, পিতৃব্যের ও পরিজনবর্গের নিধন, ভূপেন্দ্র নিরুদ্দেশ—ইহা ভাবিয়া হেমপ্রভা স্থির করিল, জগতে তাহার জন্য সুখ নাই; জীবনে যে, কত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

উভয়ে মনের কষ্টে সেই রাত্রি কাটাইলেন এবং তাহার পরদিবসই ব্রহ্মানন্দ স্বামী চন্দ্রনাথ গমনেচ্ছু হইয়া রওনা হইলেন। পথের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য সুখলাল মিশ্রের নিকট হইতে অর্থ আনাইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।



বালিকার ভালবাসা।

সুচিকিৎসায় সুরবালার বাহ্যিক রোগের অনেক উপশম হইল, কিন্তু আন্তরিক রোগ তাঁহাকে দিন দিন শুষ্ক এবং দুর্ব্বল করিতে লাগিল। সুরবালার কন্যা গিরিবালা দিন দিন বড় হইতেছে,—বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালিকার সৌন্দর্য্যও ক্রমশঃ বিকশিত হইতে আরম্ভ করিল। গিরি যখন পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা, শশিশেখর সেই সময় দশম বর্ষীয় বালক। সেই সময় ইচ্ছা হইত শশিশেখরের সঙ্গে একত্রে খেলায়, একত্র আহার করে। বালক শশিশেখর তাহাকে খেলার সঙ্গী করিত না বরং একা পাইলে গিরিকে কিলটী চড়টী মারিয়া কাঁদাইয়া পলায়ন করিত; অবোধ বালিকা তথাপি শশিশেখরের সঙ্গেই পুনরায় খেলিতে চাহিত। শশিশেখরের মাতা বালিকার এভাব দেখিয়া তাহাকে "বউ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন বালিকাও নিজকে তাহাই স্থির করিত; কিন্তু শশিশেখর মনে ভাবিত আমি গিরিকে বিবাহ করিব না। ক্রমে গিরিবালা অষ্টম বর্ষে আসিয়া পৌঁছিল, তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইল, সে এখন আর শশিশেখরের সম্মুখে যাইতে তত বাড়াবাড়ি করিত না। গিরি এখন পুষ্পোদ্যানে যাইয়া ফুল কুড়াইত; মাকে, শশিশেখরের মাকে ফুল আনিয়া দিত; সময় সময় ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিত, গাঁথিয়া নিজেই ছিঁড়িয়া ফেলিত; আবার গাঁথিত, আবার ছিঁড়িত। গিরিবালা শৈশব হইতে মা ভিন্ন কিছু জানিত না; সে অন্যান্য বালক বালিকা অপেক্ষা মাকে অধিক ভাল বাসিত। মাকে সর্ব্বদা চিন্তাকুল দেখিয়া সেও অন্যমনে কি

যেন চিন্তা করিত ; অন্যান্য বালক বালিকার মত কখন হাসিত না, কখন নাচিত না, সর্ব্বদা মার কাছে থাকিয়া তাঁহারে বিষন্নাবস্থার বিষয় ভাবিত। গিরি বালিকা বয়স হইতেই চিন্তাপরায়ণা বলিয়া, যৌবনে তাহার ধারণাশক্তি অতিশয় বলবতী হইয়াছিল। গিরিবালা কোন সময় বাগানে যাইয়া, একটী প্রস্ফুটিত গোলাপের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত ; কোন সময় বা উদ্যান মধ্যস্থিত পুষ্করিণী তীরে বসিয়া, অন্যমনস্কে মৃদু বায়ু সন্তাড়িত ক্ষুদ্র জলতরঙ্গ দেখিত। গিরিবালার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শশিশেখরেরও স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সে আর এখন গিরিবালাকে মারে না, তাহার নিকট থাকিতে ভালবাসে এবং গিরি তাহার সহিত কথা কহিলে সুখী হয়। কিন্তু ইহাত এখন বড় ঘটিয়া উঠে না। শশিশেখরকে এখন লেখা পড়াতেই নিযুক্ত থাকিতে হয়। রঘুপতি আদর করিয়া গিরিকে লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন। বাল্যক্রীড়া সম্বন্ধে গিরিবালার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইল বটে ; কিন্তু শশিশেখরের প্রতি তাহার বাল্যপ্রসূত ভালবাসা অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গেল। ভালবাসার অধীন হইয়া সে এখন শশিশেখরের সঙ্গে খেলাইতে, তাহার কাছে যাইতে চাহিত না বটে ; কিন্তু যদি কোন কাজ করিয়া শশিশেখরকে সুখী করিতে পারিত, নিজের কষ্ট হইলেও তাহা সম্পাদন করিতে গিরিবালা প্রাণপণে চেষ্টা করিত। এক দিন শশিশেখরের শরীর অসুস্থ ছিল, সে একটী আঁব খাইতে চাহিলে, তাহার মা বলিলেন "তোমার শরীর অসুস্থ আঁব খাইলে আরো অসুখ বাড়িবে।" গিরিবালাও তাহা শুনিল। সেই দিন অপরাহ্নে গিরি বাগান হইতে কয়েকটী আঁব কুড়াইয়া লইয়া আসিতেছে, শশিশেখর তাহা দেখিতে পাইয়া বলিল "গিরি, আমাকে একটী আঁব দিবে ?" গিরি জানিত উহা খাইলে তাহার ব্যারাম বৃদ্ধি পাইবে, সে বলিল "আঁব খাইলে তোমার

অসুখ বাড়িবে।” শশিশেখর কতবার চাহিল কিন্তু গিরি তাহাকে কোন মতেই দিল না। শশিশেখর যেন একটু দুঃখিত হইল, তাহাকে দুঃখিত দেখিয়া, বালিকা গিরি আমগুলি সম্মুখস্থ পুষ্করিণী জলে অনায়াসে নিক্ষেপ করিল। শশিশেখর একটু অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “এরূপ করিলে যে?” গিরিবালা বলিল “তুমি খাইবে না যে।”

গিরি রূপ কথা শুনিতে বড় ভাল বাসিত। ভূতের গল্প, দেবতার কথা, অসুরের কাণ্ড, যাহা কিছু অদ্ভুত এবং অমানুষিক সে তাহা শুনিয়া বড় সুখী হইত এবং তৎসঙ্গে নিজের বালিকাকল্পনা মিশ্রিত করিয়া কত কি ভাবিত। যাহাতে বালক বালিকাগণের ভয় তাহাতে তাহার কৌতূহল হইত। আকাশ যখন ঘনঘটাচ্ছন্ন, মেঘ গর্জ্জনে স্বর্গ মর্ত্ত শব্দিত ও স্তম্ভিত হইত, প্রবল বাত্যাবেগে পার্থিব বস্তু সকল বিকম্পিত হইত, যখন ভয়ে শিশুগণ মাতৃকোল আশ্রয় করিত, তখন গিরিবালা হয় এক জানালায় অথবা কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া প্রকৃতির এই ভীষণ বিপ্লব অভিনয় নির্ভয় চিত্তে দর্শন করিত। এক দিন গিরিবালা সন্ধ্যার প্রাকালে বাগানে যাইয়া বসিল। বসিয়া বসিয়া পাখী দেখিল, ফুল দেখিল, কত কি দেখিল, অবশেষে তাহার মন পৃথিবী ছাড়িয়া আকাশে উঠিল। একটী নবোত্থিত নক্ষত্রের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। কতক্ষণ তৎপ্রতি চাহিয়াই বসিয়া আছে। হঠাৎ শশিশেখর আসিয়া, তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল “গিরি, কি দেখিতেছ?” গিরিবালা আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল “ঐ দেখিতেছ না?” শশিশেখর তাহার কনক-চম্পকদাম-নিন্দিত-অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট দিকে চাহিয়া বলিল “কৈ, কিছুইত দেখিতে পাই না।”

গিরি। কিছুই না?

শশি। না, কিছুই না।

গিরি। দেখিতেছ না আকাশের কোলে কেমন একটী সুন্দর নক্ষত্র ফুটিয়াছে?

শশি। ও আর কি দেখিব? উহা নিত্যই দেখি। উহাতে নূতনত্ব কি আছে?

গিরি। নিত্য দেখি বটে সত্য, কিন্তু যখন মনোযোগ করিয়া দেখি তখনই যেন ইহাতে কি দেখিতে পাই।

শশি। কি দেখিতে পাও গিরি?

গিরি। "তা বুঝিতে পারি না।" শশিশেখর হাসিয়া বলিল "গিরি, তুমি পাগল।" সেই হইতে শশিশেখর গিরিবালাকে "পাগলী" বলিয়া ডাকিত। গিরিবালার তর্ক ও মীমাংসা এক নূতন প্রণালীর হইয়া দাঁড়াইল। গিরিবালা এখনও যৌবনে পদার্পণ করে নাই, বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া, দুই কালের মধ্য সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ সময় এক দিন রঘুপতির বাড়ীতে রামায়ণ পাঠ হইতেছিল। বৃদ্ধারা চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া বসিয়া অতি মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহা শুনিতেছিলেন। সে দিন সীতার বনবাস পঠিত হইতেছিল বলিয়া অনেক যুবতীও অন্তঃরালে বসিয়া তাহা শুনিতে ছিল। গিরিবালা বৃদ্ধা বা যুবতী হউক আর না হউক, এ সমস্ত বিষয় শ্রবণে বৃদ্ধাদের সহিতই তাহার বিশেষ যোগদান ছিল। সীতার বনবাস শ্রবণ করিয়া, সীতার দুঃখে বৃদ্ধাদের অপেক্ষা আজি যুবতীদের হৃদয় অধিক গলিল। সীতার অপরিমিত ভালবাসা, রামের নিষ্ঠুর ব্যবহারের বিষয় তাহাদের মধ্যে আলোচনা হইতে লাগিল। আমাদের বাল্যচিন্তা-পরায়ণা গিরিবালা পূর্ব্বাবধিই সেখানে বসিয়া রামায়ণ শুনিতেছিল, সে বলিয়া উঠিল "সীতা রামকে খুব ভাল বাসিতেন বটে, কিন্তু তাহা হইতে যে কেহ ভাল বাসিতে পারে না এমত নয়; সীতার ভালবাসাতে আশ্চর্য্যের কি আছে?" সকলে

বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিল। একটী যুবতী একটু হাসিয়া বলিল "ইহা হইতে অধিক ভালবাসা কেমন গিরি?"

গিরি। "কেন? সীতা যদি রামকে উচিত মত ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে বনে নির্ব্বাসিত হইয়া, কাঁদিলেন কেন? তিনি যখন জানিতেন তাঁহাকে গৃহে রাখিলে রামের অপযশ হয় এবং প্রজারাও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, এমত অবস্থায় তাঁহাকে বনে প্রেরণ করা কি উচিত হয় নাই? স্বামীর মঙ্গলের জন্য সামান্য সুখ আশা দূরে থাকুক, তজ্জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইলে কি স্ত্রীর তাহা সহজে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়?" শ্রোত্রীবর্গের মধ্যে এক জন উপহাস করিয়া বলিল "এ যে সৃষ্টি ছাড়া ভাল বাসার কথা কহিতেছ। আচ্ছা দেখা যাবে, তুমি তোমার স্বামীকে কত ভালবাস।" শেষ কথায় বালিকার একটু লজ্জা বোধ হইল।

শশিশেখরের প্রতি গিরিবালার ভালবাসা দিন দিন অধিকতর বদ্ধমূল হইতে লাগিল। সে ভালবাসাতে উন্মত্ততা ছিল না, চাক্‌চিক্য ছিল না, প্রশান্ত মহাসাগরের প্রশান্ত জলরাশির ন্যায় উহা স্থির এবং গম্ভীরভাবে তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। গিরিবালার গভীরতা ও বুদ্ধিপূর্ণ সরল সুন্দর আচরণে সকলেই তাহাকে নিতান্ত ভালবাসিত। রঘুপতি গিরিবালাকে নিজের কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং তিনি সময়ে সময়ে স্নেহভরে গিরিকে "মা, লক্ষ্মী" প্রভৃতি স্নেহসূচক শব্দে সম্বোধন করিতেন। রঘুপতি অতি পূর্ব্বেই শশিশেখরের বিবাহার্থে এ সুন্দর কুসুমটী মনোনীত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। এখন ভাবী পুত্রবধূর ব্যবহার দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। সুরবালা এসমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যেন কোন আন্তরিক গুপ্ত বহ্নিতে দগ্ধ হইতেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ঝড়।

বৈশাখ মাসে একদিন মেঘনা নদীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, একখানা নৌকা পাল বেগে উত্তরাভিমুখে যাইতেছিল। অতল সলিলা মেঘনা ব্রহ্মপুত্রের জল লইয়া, সমুদ্রকে উপহার দিবার নিমিত্ত নৌকা গমনের বিপরীত দিকে ছুটিতেছে। মাঝি হাল ধরিয়া বসিয়া আছে, মাল্লারা কেহ পালের দড়ি ধরিয়া আছে, কেহ অন্য কাজ করিতেছে। নদী বক্ষে কোথাও কুম্ভীর ভাসিয়া রহিয়াছে, কোথাও শুশুক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া আবার জলমগ্ন হইতেছে। নদীর মধ্যভাগ হইতে শ্বেত বালুকা সুশোভিত তীর ধূ ধূ দেখা যায়। নৌকা মধ্যে দুইজন মাত্র আরোহী, তাঁহারা বঙ্গদেশবাসী নন, তাঁহাদের চৌদ্দপুরুষের মধ্যেও কেহ কখন এরূপ প্রচণ্ড নদী দেখেন নাই। তন্মধ্যে যিনি কর্ত্তা তিনি নদীর আকার দর্শনে মহা ভীত হইয়া, নৌকাগৃহ মধ্যে যাইয়া শুইয়া রহিলেন। মাঝি-ভাই অনেক সাহস বাক্য বলিল—কারণ তৎকালে আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। কিন্তু তিনি মাথা তুলিয়া নদীর দিকে চাহিতে পারিলেন না। অপর ব্যক্তি একটী কাতর বালিকা, সেও নৌকামধ্যে শয়ান রহিয়াছে। তাহাদের নৌকা কিসের মধ্য দিয়া চলিতেছে বালিকার সে দিকে মন নাই। বায়ুবেগ মধ্যবিৎ ছিল, নৌকাখানা নাচিতে নাচিতে যাইতেছে। ক্রমে বায়ুর গতি মন্দ হইয়া আসিল, পালের বল নিস্তেজ হইয়া পড়িল। মাল্লারা পালের কিনারায় রজ্জু কমাইয়া দিল, তথাপি পালে আর জোর করিল না। মাল্লাগণ মাঝির আদেশক্রমে পাল নামাইয়া, দাঁড় বাহিতে লাগিল।

নৌকা জলবেগ অতিক্রম করিয়া এখন বড় যাইতেছে না। বাতাস

ও একবারে কমিয়া গেল; পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে হঠাৎ একখানা মেঘ দেখা দিল। মেঘনার কাল জলে, কাল মেঘের ছায়া পড়িয়া, নদী-বক্ষ এক ভীষণ দর্শন হইয়া উঠিল।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বাতাস আবার ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। ঝড়ের আগমন বার্ত্তা পাইয়া মেঘনার জল কল কল শব্দে তরঙ্গখেলা খেলিতে লাগিল। ভয়ে নৌকারোহী পুরুষের প্রাণ শুকাইয়া গেল। মাঝিকে শশব্যস্তে বলিলেন "মাঝি, নৌকা কিনারার দিকে ধর।" মাঝিভায়ার মুখ হইতে আর সাহস বাক্য বাহির হইল না, ভীতস্বরে বলিল "কর্ত্তা, নদীর অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।" মাল্লারা দুর্গাপূজার ছাগলের মত একে অন্যের মুখপানে চাহিতে লাগিল। কর্ত্তা ভীত হইয়া বলিলেন "কি বলিলে মাঝি, নদীর অবস্থা ভাল দেখিতেছ না।" এই বলিয়া মৃত্যু আসন্ন ভাবিয়া, বালিকার ভয়ে ও নিজের প্রাণভয়ে "গঙ্গা মাই, গঙ্গা মাই" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। আবার যেন কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "সখে! যে রত্ন আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলে, আর বুঝি তাহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না" মাঝি কায়মনোবাক্যে পাঁচপীরের সিন্নি মানিল, মাল্লারা নৌকার মাথায় জল সিঞ্চন করিল। পাষাণ পাঁচপীরের কৃপা হইল না, বাতাস প্রবলবেগে ছুটিল, সমস্ত আকাশ মেঘে ব্যাপ্ত হইয়া জগত অন্ধকার করিয়া ফেলিল। তরঙ্গ মুখ ফাটিয়া শ্বেতবর্ণ দেখাইতে লাগিল। প্রবল তরঙ্গ সমূহ আপনাদের সুদিন বুঝিয়া, সগর্ব্বে নৌকার উপর দিয়াই চলিয়া যাইতে লাগিল। সময় পাইয়া বৃষ্টিও আকাশ হইতে বড় বড় ফোটায় পড়িতে আরম্ভ করিল। নৌকারোহী সমস্ত লোকই এখন এক এক দেবতাকে আহ্বান করিয়া, তাহাদিগকে নানা প্রকার মানন করিতে লাগিলেন। নৌকামধ্য হইতে বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিল।

তাহাকে সান্ত্বনা না করিলে নয়; উদাসীন হস্ত পদ কাঁপাইতে কাঁপাইতে তাহাকে ধরিয়া বসিলেন এবং কম্পিত স্বরে বলিলেন "ভয় নাই" এই বলিয়া কয়েকটী বালিশ তাহার শরীরের সহিত বান্ধিয়া দিলেন।

তুফান নিতান্ত প্রবলবেগেই বহিতে লাগিল। নদীর কল কল ধ্বনি, মেঘের ঘর্ঘর গর্জ্জন, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনা যাইতেছে না। নৌকা এ অত্যাচার অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না; আরোহীগণ সহ জলমগ্ন হইয়া গেল। নৌকা আর দেখা গেল না, ভাসমান নারিকেলবৎ কয়েকজন আরোহীর মস্তক তরঙ্গাঘাতে এক এক বার অদৃশ্য, আবার দৃষ্টিগোচর হইতে হইতে স্রোত বেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মেঘনা অনেক চড়নদারের নৌকা, মহাজনের নৌকা উদরসাৎ করিয়া, আহার প্রাপ্ত ক্ষুধিত ব্যক্তির ন্যায় কিঞ্চিৎ শান্ত হইল। পবন বেটার ক্রোধ কিছুতেই থামিতে চায় না, সে মধ্যে মধ্যে ঝট্‌কা বায়ু ছাড়িয়া, পাগল নদীকে আরো মাতাইয়া দেয়। অবশেষে বাতাসও এ প্রবল সমরে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম লাভ করিল। পৃথিবী পুনরায় শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

হৃদয়োদ্ধার।

এই মাত্র তুফান হইয়া গিয়াছে। আকাশ এখন সম্পূর্ণ নির্ম্মল, মেঘ সমুদয় চীৎকার করিয়া, গলা বাজি করিতে করিতে হিমালয়ের দিকে চলিয়া গেল। মেঘপ্রিয়া মেঘনা প্রিয়তম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, মনো-

দুঃখে মন্থর গতিতে সাগর জলে জীবন সমর্পণ করিতে চলিল। পবন সদাগতি সদানন্দ, নিজেই মেঘকে তাড়াইয়া দিয়াছে, এখন আবার উড়িয়া উড়িয়া মেঘপ্রিয়ার দশা অবলোকন করিতে লাগিল। যেমন হিন্দুজাতির পরস্পর অনৈক্যতা নিবন্ধন হিন্দু বিক্রমের পর মুসলমান বিক্রম, মুসলমান বিক্রমের পর ব্রিটিশ বিক্রম সুবিস্তীর্ণ ভারত রাজ্যে রাজত্ব করিতেছে; সেইরূপ বিপক্ষ দলের পরস্পর অসদ্ভাব দর্শনে তপনদেব আবার নিজের সুযোগ ভাবিয়া, রাজত্ব অধিকার করিয়া লইল এবং মেঘপ্রিয়ার অভিমান দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে পশ্চিমে গমন করিল। সন্ধ্যা আগত প্রায়। কৃষক গৃহিণীরা ব্রজগোপিনীর ন্যায় কলসী কক্ষে দলে দলে আসিয়া, সূর্য্য থাকিতে থাকিতে মেঘনা হইতে জল তুলিতে লাগিল। নদীতীরে রাখালেরা গান করিতে করিতে গরুর পাল একত্রিত করিতেছে। কর্দ্দমিত কলেবর চাষা হাল্ ছাড়িয়া জলে অবগাহন করিল। প্রণয়িণীর মনস্তুষ্টি মানসেই যেন প্রথমতঃ নেড়া মাথা, পরে দাড়ি ক্রমে সকল শরীর মার্জ্জনা করিতে লাগিল। শরীর ধৌত করণান্তর সহজ তৃপ্ত কৃষক আর্দ্র শরীরেই পিণ্ডকৃত মলিন বাস খুলিয়া পরিধান করিল; তৎপর ত্যক্ত আর্দ্র বস্ত্র নিংড়াইয়া শরীর মুছিল। পরিধেয় বস্ত্র গুটাইয়া গুটাইয়া যথাসাধ্য তাহার সৌন্দর্য্য সাধন করিতে ত্রুটি করিলনা। তাহাদের মধ্যে কেহ প্রফুল্ল মনে নদীতীরেই পশ্চিমমুখে নেমাজ পড়িতে বসিল; কেহ বা পরিচ্ছদের দিকে চাহিতে চাহিতে বাড়ী চলিয়া গেল। গৃহিণী পূর্ব্বেই গৃহদ্বারে কাষ্ঠপাদুকা ও জলপূর্ণ বদ্না রাখিয়াছে; কৃষক সেই জলে পদ ধৌত করিয়া ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া আরাম করিতে বসিল। রৌপ্যনথ-সুসজ্জিত-নাসিকা-বিশিষ্টা কৃষক-ভামিনী অগ্নিতে ফুঁ লাগাইতে লাগাইতে কল্কে আনিয়া হুঁকার উপরে রাখিল; কৃষক নলে মুখ লগ্ন করিয়া চোক্ বুজিয়া, টানিতে টানিতে স্বর্গসুখ ভোগ করিল।

গিরিবালার মাতার পীড়া নিতান্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। ঝড়ের পূর্ব্ব-ক্ষণেই ভূপেন্দ্র চিকিৎসক আনিবার জন্য চিকিৎসকের বাড়ী গিয়াছিলেন। এখন নদীতীর বাহিয়া বাড়ী প্রত্যাগমন করিতেছেন। ভূপেন্দ্র নদীতীরের যে অংশ দিয়া যাইতে ছিলেন, তাহার অতি সন্নিকটেই নদীগর্ভে একটী চড়া ছিল। ভূপেন্দ্র দেখিতে পাইলেন চড়ার নিকট দিয়া একটা মনুষ্য দেহ ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি প্রথমতঃ জলমগ্ন ব্যক্তির একটী বাহু দেখিলেন এবং পরক্ষণেই আবার মস্তক দেখিয়া স্থির করিলেন কোন স্ত্রীলোক জলমগ্ন হইয়াছে। অবস্থা দর্শনে এখনও জীবিত বলিয়া বোধ হইতেছে। ভূপেন্দ্র আর তীরে দাঁড়াইতে পারিলেন না, উহাকে রক্ষা করিবার মানসে নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। স্রোত বেগবশতঃ শীঘ্র তাহার নিকট যাইতে পারিলেন না; কিন্তু সন্তরণক্ষম ছিলেন বলিয়া, অনতিবিলম্বেই তথায় যাইয়া উহাকে ধরিয়া চড়ার কিনারায় তুলিলেন। এক্ষণে অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, জলোদ্ধৃতা স্ত্রীলোকটীকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না। নাসিকায় হস্ত সংলগ্ন করিয়া, নিশ্বাস প্রশ্বাসের লক্ষণ প্রাপ্ত হইলেন। একবার ডাকিলেন, তাহাতে যেন স্ত্রীলোকটীর মুখ হইতে কোন শব্দ বাহির হইতেছিল বলিয়া বোধ হইল। উভয়ের বস্ত্রই সম্পূর্ণ আর্দ্র, তীরে লইয়া যাওয়াও সহজ ব্যাপার নয়। ভূপেন্দ্র আর কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, স্ত্রীলোকটীর বস্ত্র সাধ্যমত নিংড়াইয়া দিলেন এবং চড়া হইতে কতকগুলি খড় সংগ্রহ করিয়া, উহাকে তাহার উপর রাখিলেন; রাখিয়া গরম করিবার মানসে, হস্ত দ্বারা উহার হস্ত পদ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল; স্ত্রীলোকটীও যেন কিঞ্চিৎ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া হস্ত পদ নাড়িতে লাগিল, কিন্তু তখনও কথা বলিতে পারিতেছিল না। এমত সময় ভূপেন্দ্র দূরে এক ব্যক্তির গান

শুনিতে পাইলেন। গানের স্বর ক্রমেই যেন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। এক জন মৎস্যজীবী চড়ার কিনারা দিয়া গাইতে গাইতে, নৌকা বাহিয়া যাইতেছিল।”

সখি তোর ধরি দুটি পায়,
আমার সে কালাচাঁদে দে এনে ত্বরায়।

নৌকা নিকটবর্ত্তী হইলে পর ভূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন “কে যাও ভাই ?”

নৌকাবাহী তথাপি গাহিতেছে—

কালার মাথায় ময়ূরের পাখা,
নবীন মেঘের বরণ ত্রিভঙ্গ বাঁকা,
করে বাঁশী কাল শশী,
সে রূপ কি ভুলা যায় ?

ভূপেন্দ্র আবার বলিলেন “ওহে ভাই কথা কহিতেছ না যে ?”

নৌকাবাহী। কেন ?

ভূপেন্দ্র। নৌকা লইয়া এ দিকে আইস।

নৌকাবাহী। “এখন আমার সময় নাই—” এই বলিয়া আবার গাইতে লাগিল—

কোকিল ডাকে গাছের উপর,
ঘরে থাকি ঝরে আঁখি হই যে ফাঁফর,
বুঝে না সই পোড়া লোকে,
কলঙ্কিনী কয় আমায়।

ভূপেন্দ্র ভাবিলেন নৌকাবাহী ছোট লোক, অর্থের প্রলোভন না দেখাইলে নিকটে আসিবে না। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন “ওহে ভাই,

এ দিকে এক বার আইস, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার কার্য্য সমাপন হইলে তোমাকে পুরস্কৃত করিব।" নৌকাবাহী এবার গান ক্ষান্ত করিল; কিন্তু সম্বোধন কারীকে তস্কর বোধে, তাঁহার সম্মুখে যাইতে সাহস পাইল না; বলিল "তুমি কে?" ভূপেন্দ্র নৌকাবাহীর ভীতি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "নিকটেই আমার বাড়ী, আমি দস্যু নই, তোমার কোন ভয় নাই।" নৌকাবাহী নৌকা লইয়া কিনারায় গেল।

ভূপেন্দ্র। "একটা আলো লইয়া আইস।" নৌকাবাহী একটী আলো লইয়া তীরে উঠিল এবং বিশেষ রূপে ভূপেন্দ্রকে দেখিতে লাগিল, ভূপেন্দ্রের সম্মুখে মনুষ্য দেহ দেখিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভূপেন্দ্র। "এ জীবিত দেহ, কোন ভয় নাই।"

নৌকাবাহী ভূপেন্দ্রের নিকটে যাইয়া, তাঁহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি দর্শনে, তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত লোক বোধে একটা নমস্কার বাজাইয়া বলিল "আজ্ঞে আমরা ছোট লোক, এ নদীতে মাছ ধরিয়া দিন কাটাই। এ গরিবের অপরাধ লইবেন না।"

দীপালোকে যখন সেই স্থান আলোকিত হইল, ভূপেন্দ্র স্ত্রীলোকটীকে চিনিতে পারিয়া, উন্মত্তের ন্যায় "কে? হেমপ্রভা, আমার প্রাণের হেমপ্রভা, তুমি" এই বলিয়া রমণীকে একেবারে বুকে তুলিয়া লইলেন। কতক্ষণ পর্য্যন্ত আর একটী [illegible] মুখ হইতে বাহির হইল না। হর্ষোত্তেজনায় চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। মৎস্যজীবী এ ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে ভূপেন্দ্রের মনে হইল এখন বুকে রাখিবার সময় নয়। তিনি ধীবরকে নৌকা হইতে এক খানা শুষ্ক বস্ত্র আনিতে বলিলেন; ধীবরও বিনা আপত্তিতে তাহার মলিন জীর্ণ বস্ত্র আনিয়া অগৌণে হাজির করিল। হেমপ্রভাকে শুষ্কবস্ত্র পরাইয়া, উভয়ে ধরাধরি করিয়া নৌকায় তুলিলেন। ধীবর অগ্নি জ্বালিয়া

দিল; ভূপেন্দ্র ত্বরিত হস্তে হেমপ্রভার শরীরে সেক দিতে লাগিলেন। এই অবসরে ধীবর নৌকা বাহিয়া তীরে লইয়া আসিল। হেমপ্রভা এখন চক্ষু মেলিয়া চাহিল; সমস্ত যেন তাহার নিকট স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। মৃদুস্বরে বলিল "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?"

ভূপেন্দ্র। "না হেমপ্রভা, তুমি তোমার ভূপেন্দ্রকেই সম্মুখে দেখিতেছ।" জীবনের সুখ যাঁহার হস্তে ন্যস্ত; সমস্ত জগত বিপক্ষে দাঁড়াইলেও যাঁহার নিকট থাকিয়া, হেমপ্রভার কোন ভয় হয় না; আজি সেই ভূপেন্দ্রর কোলেই এ বিপৎপাতের পর হেমপ্রভা শয়ান রহিয়াছে। এখন শরীর গরম হইয়া, শোণিত স্রোত ধমনীতে প্রবাহিত হওয়াতে হেমপ্রভার হস্ত পদ নাড়িবার শক্তি হইল। হেমপ্রভাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া, ভূপেন্দ্রের হৃদয়ে যে, এক কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা আমরা বর্ণনা করিব না। তাঁহার তৎকালীন হৃদয়ের ভাব বর্ণনে চেষ্টা পাওয়া বৃথা; কেন না তাহা হইলে নিশ্চয়ই অকৃতকার্য্য হইতে হইবে। হেমপ্রভা ভূপেন্দ্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। প্রথম দর্শন জনিত উভয়ের হৃদয়ের বেগ কথঞ্চিত উপশমিত হইলে পর ভূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বিপদ কিরূপে ঘটিল?"

হেম। অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে ঝড় হইয়াছে, তাহাতে আমাদের নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে।

ভূপে। "তোমরা এদেশে কি প্রকারে আসিলে?" লুমাতে অবস্থান, পিতার বিপৎপাতের সম্ভাবনা ও পত্রপ্রাপ্তি সম্বাদ হেমপ্রভা একে একে ভূপেন্দ্রকে বলিল; বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু অশ্রু ধারায় পূর্ণ হইয়া আসিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ভূপেন্দ্র, যদি তুমি এ সময় পশ্চিমে থাকিতে, পিতার অনেক সাহায্য করিতে পারিতে।"

ভূপে। তোমার পিতা কখনো বিপদে পড়িবেন না। আচ্ছা তোমরা তাঁহার পত্র পাইয়া কি করিলে?

হেম। পিতার আদেশ মতে আমরা সুখলাল মিশ্র নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ আনাইলাম এবং জলপথে চন্দ্রনাথ যাইয়া কতকদিন অবস্থান করিলাম। সেখানে থাকিয়াও পিতার অনুসন্ধান পাইলাম না। অবশেষে তথায় তাঁহার আগমন অসম্ভব ভাবিয়া, চন্দ্রনাথ হইতে কামক্ষ্যা রওনা হইলাম। পথিমধ্যে আমাদের এই বিপদ উপস্থিত।

ভূপে। তোমার পালনকর্ত্তা সেই ব্রহ্মানন্দ স্বামী কোথায়?

হেম। "আমাদের নৌকা জলমগ্ন হওয়ার পর, কে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে জানি না। তিনি আমাকে সন্তানাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করেন। ঈশ্বর কি সেই ধার্ম্মিক প্রবরকে এবিপদ হইতে বাঁচাইবেন না?" এই বলিয়া হেমপ্রভা কাঁদিতে লাগিল।

ভূপে। তুমি তাঁহার জন্য ভাবিও না, কল্যই তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইব। তিনি হয়ত স্রোতবেগ বশতঃ অন্য কোন স্থানে যাইয়া পড়িয়াছেন।

রাত্রি অধিক হইয়াছে। ভূপেন্দ্র চিকিৎসকের বাড়ী হইতে গৃহে ফিরিলেন না দেখিয়া, শশিশেখর কয়েকজন লোকের সহিত তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। নদীর তীরে আসিয়া নৌকামধ্যে তাঁহার স্বর শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভূপেন্দ্র এখানে?"

ভূপে। কে, শশিশেখর?

শশি। হাঁ, তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? নৌকামধ্যে কি করিতেছ?

ভূপে। পরে জানিতে পারিবে। তোমার সঙ্গে কোন লোক আসিয়াছে?

শশি'। আসিয়াছে।

ভূপে। তাহাকে পাঠাইয়া একখানা শিবিকা ও বাহক আনিতে বল। শশিশেখর তৎক্ষণাৎ একটী লোককে তদানয়নার্থে পাঠাইয়া দিয়া, নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকামধ্যে হেমপ্রভাকে দেখিয়া, একটু বিস্মিত ভাবে বলিলেন "ভূপেন্দ্র, এ কে?"

ভূপে। "বীরশ্রেষ্ঠ তান্তিয়া টোপীর কন্যা হেমপ্রভা।" শশিশেখর আরো কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলেন। ভূপেন্দ্র বলিলেন "পরে সকল জানিতে পারিবে।"

বাহকেরা শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। হেমপ্রভাকে শিবিকারূঢ়া করাইয়া, ভূপেন্দ্রও শশিশেখর গমনে উদ্যত হইলেন। ধীবর একপাশে দাঁড়াইয়া বলিল "আজ্ঞে আমার বিষয়টা?" ভূপেন্দ্র শশিশেখরের নিকট হইতে পাঁচটী টাকা লইয়া, ধীবরকে দিয়া বলিলেন "যদি তুমি ব্রহ্মানন্দ স্বামী নামক একজন উদাসীনের সংবাদ আমাকে জানাইতে পার, তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিব।"

ধীবর। আজ্ঞে মহারাজ, আমরা আপনাদের প্রতিপালিত দাস, একাজ করিতে অবশ্য চেষ্টা করিব। আজ্ঞে সে লোকটীর নাম কি বলিলেন? বর্ম্মালণ্ড?

ভূপে। "হাঁ, ব্রহ্মানন্দ স্বামী" এই বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

—:••:—

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রহস্যভেদ।

ভূপেন্দ্র যেদিন হেমপ্রভাকে নদী গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া, বাড়ী লইয়া আসিলেন, তাহার পর হইতে কতকদিন নদীতীরে হাঁটিয়া হাঁটিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ স্বামীর কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। অবশেষে নিষ্ফল ভাবিয়া, অনুসন্ধানে বিরত হইলেন। হেমপ্রভা তাহার পালনকর্ত্তা উদাসীনের জন্য অত্যন্ত কাঁদিল এবং পিতার কোন তত্ত্ব না পাইয়া নিতান্ত কাতর হইল। গিরিবালা এতদিনে জানিতে পারিল, হেমপ্রভা তাহার দাদা ভূপেন্দ্রের হৃদয় বিহারিণী স্বর্ণপ্রতিমা। একদিন পীড়ার মোহে ভূপেন্দ্র যে, "হেমপ্রভা" নাম করিয়াছিলেন, গিরি আজি তাহার মর্ম্ম অবগত হইল। সমবয়স্কা যুবতীদ্বয় এখন একে অন্যের মরমের সখী। উভয়ে একত্র আহার, একত্র শয়ন করিত; একে অন্যের নিকট সুখ দুঃখের আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইত।

সুরবালার রোগ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল। চিকিৎসকের চিকিৎসা তুচ্ছ করিয়া, রোগ তাঁহার জীবন শেষ করিতে বসিল। একদিন সুরবালা শয্যায় শুইয়া আছেন, হেমপ্রভা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। গিরিবালাও স্নেহময়ী জননীর অনবরত শুশ্রূষা করিতেছে। হঠাৎ সুরবালার শরীর অস্থির হইয়া উঠিল; সমস্ত শরীর হইতে ঘর্ম্ম বহির্গত হইতে লাগিল; তাঁহার গ্রীষ্ম যাতনা নিতান্ত প্রবল হইয়া পড়িল। হেমপ্রভার অবিরাম ব্যজনেও তাহা নিবৃত্ত হইতেছে না। সুরবালা এখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার দিন ফুরাইয়াছে, মৃত্যু নিকট। গিরিবালাকে বলিলেন, "ভূপেন্দ্র ও শশিশেখরকে ডাকিয়া আন।"

গিরিবালা মার অবস্থা বুঝিতে পারিল না,সে ভূপেন্দ্র ও শশিশেখরকে ডাকিতে চলিয়া গেল। সুরবালা হেমপ্রভাকে বলিল "হেমপ্রভা, আমার শরীর যেন কেমন করিতেছে, বোধ হয় আর বাঁচিব না।"

হেম। দুর্ব্বলতার জন্য আপনার শরীর অস্থির হইয়াছে বলিয়াই এরূপ বোধ করিতেছেন।

সুর। না, মা, আমি আর অধিকক্ষণ বাঁচিব না। আমার এখন মরিলেই শান্তি।

হেম। আপনি এরূপ কথা বলিবেন না।

শশিশেখর ও ভূপেন্দ্রকে লইয়া গিরি আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। মৃত্যুশয্যাশায়িনী সুরবালা অজিতের প্রতিবিম্বস্বরূপ ভূপেন্দ্রকে সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন; কতক্ষণ দেখিয়া অতি ধীরে বলিলেন "শশিশেখর, ভূপেন্দ্র, আর বোধ হয় তোমাদিগকে দেখিতে পারিব না। আমার নিরাশ্রয়া গিরিবালাকে তোমরা দেখিও।"

শশি। আপনি আজি এরূপ বলিতেছেন কেন?

সুর। "আমার মৃত্যু নিকটে।" ভূপেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাছা ভূপেন্দ্র, তোমাকে একটী কথা বলিব মনে করিয়াছি। এখন আমি পৃথিবী ছাড়িয়া চলিলাম, আজি তোমাকে সেই কথা বলিয়া যাই।" মার কথা শুনিয়া গিরিবালা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। এই সংবাদ শুনিয়া রঘুপতি ও তাঁহার স্ত্রী দৌড়িয়া আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন; বাড়ীর লোকে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। সকলেই শুশ্রূষায় নিযুক্ত, এমত সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল "একজন ধীবর ব্রহ্মানন্দ স্বামী নামক এক বৃদ্ধ উদাসীন্‌কে লইয়া বহির্ব্বাটীতে আসিয়াছে।" হেমপ্রভার ইচ্ছা হইল দৌড়াইয়া যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে, কিন্তু সুরবালার নিকট

হইতে উঠিতে পারিল না। রঘুপতি বৃদ্ধ, তাঁহার বিশ্বাস উদাসীনেরা অনেক রোগের চিকিৎসা জানেন। তিনি ভৃত্যকে বলিলেন "উদাসীনকে এখানে লইয়া আইস।" ভৃত্য ত্বরিত গতিতে যাইয়া ব্রহ্মানন্দকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া আসিল। ব্রহ্মানন্দ জলমগ্ন হইয়া ভাটিতে অনেক দূরে যাইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে অনেক দিন হেমপ্রভার অনুসন্ধান করিয়াছেন; কিন্তু কোথাও তাহার কোন সংবাদ পান নাই। পরে এক দিন পূর্ব্বোক্ত ধীবরের সহিত সাক্ষাৎ হয়; তাহার মুখে হেমপ্রভার রক্ষা ও অবস্থান সংবাদ শুনিয়া রঘুপতির বাড়ীতে আসিয়াছেন। সুরবালার শয্যাপার্শ্বে হেমপ্রভাকে দেখিয়া, ব্রহ্মানন্দ অত্যন্ত সুখী হইলেন। রঘুপতি উদাসীন্‌কে বলিলেন "অন্য সংবাদ পরে শুনিতে পারিবেন, আপনি এই রোগীটীকে একবার দেখুন।" সুরবালা উদাসীন্‌কে দেখিয়া "কে, অজিৎ?" এই বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন! মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া, গিরিবালা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। গৃহস্থ সকলেই সুরবালার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিবার জন্য প্রয়াস পাইল। যে সময় যে মোহন রূপ দেখিয়া, অজিৎ সিংহ সুরবালার জন্য পাগল হইয়াছিলেন, সেই সময় সেইরূপ সুরবালাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মানন্দ স্বামী রুগ্না, ক্লিষ্টা সুরবালাকে হঠাৎ চিনিতে পারিলেন না; পরে চিনিতে পারিয়া, বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে সুরবালার মোহ অপনীত হইল; তিনি পাগলের ন্যায় বলিতে লাগিলেন "প্রিয়তম, চিনিতেছ না? অজিৎ, যে হতভাগিনী তোমাকে স্বর্গ ভাবিয়া হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াছিল, যে বাল বিধবার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তুমি দিদীকে হারাইয়াছ, আমি সেই হতভাগিনী সুরবালা।" সুরবালা গিরিকে দেখাইয়া বলিলেন "এ তোমার কন্যা, এ হতভাগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" ভূপেন্দ্রকে নির্দ্দেশ করিয়া

বলিলেন "এই দিদীর হৃদয়ের একমাত্র ধন ভূপেন্দ্র।" নিজের যৌবন কাণ্ড মনে করিয়া, উদাসীনের চক্ষু হইতে দর দর জল পড়িতে লাগিল। পাগলের মত সুরবালার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন "সুরবালা, আমাকে ক্ষমা কর।" ভূপেন্দ্র ও গিরিবালা কাঁদিতে লাগিলেন; রঘুপতি ও শশিশেখর প্রভৃতি সকলে এই দৃশ্য দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। হেমপ্রভারও চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। সুরবালার এখন মরিতে ইচ্ছা হইল না।

প্রিয় পাঠক, তুমি পার্থিব জীব; ভৌতিক পদার্থ তোমার দেহের উপকরণ; শত সহস্র প্রকারে তুমি সংসার সুখ হইতে বিচ্যুত হওনা কেন, শত শত শোক দুঃখ তোমার প্রতি জ্বলন্ত ক্রোধ বর্ষণ করিয়া, তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করুক না কেন, তুমি কি প্রকারে ভৌতিক মোহ ছাড়িতে পারিবে? অন্ন কষ্টে তোমার জীবন কণ্ঠাগত, কখন জগতের সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায় তাহার স্থিরতা নাই; পুত্রশোক, কন্যাশোক, ভ্রাতৃশোক তোমার হৃদয়ে শত শত শেলাঘাত করিয়া, তোমাকে জড়বৎ করিয়া, রাখিয়াছে; কষ্টের উত্তেজনায় মরিলেই শান্তিলাভ হইবে বিবেচনা কর, কিন্তু মৃত্যু করাল বদন ব্যাদানে যখন তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আসিবে, তখন কি তুমি তাহাকে সহজে আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে? তখন কেহ বলিবে, সংসার ছাড়িয়া কোথায় চলিলে? এ রাজ্য ছাড়িয়া কোন রাজ্যে চলিলে? অমনি তোমার মরণের সাধ আর রহিল না, তোমার আবার বাঁচিতে ইচ্ছা হইল। যদি তখন তোমার ক্ষমতা থাকিত, তুমি বলিতে "আমি মরিতে পারিব না, লোকসমাজ, আমাকে বাঁচাও। জগতে থাকিয়া শত শত কষ্টও আমি সহ্য করিব কিন্তু মরিতে পারিব না।" মৃত্যু সময়ে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া, তোমাকে কে এরূপ পরামর্শ দিল? তুমি বলিবে "বুঝিতে পারি না;" আমরা বলি

ভৌতিক মোহ। ভৌতিক মোহ কি? আমাদের দেহের সহিত ভৌতিক জগতের সহিত যে আকর্ষণ রহিয়াছে; যে আকর্ষণ বলে আমরা আমাদিগকে পৃথিবীর লোক বলিয়া পরিচয় দেই; চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই অনিশ্চিত রাজ্যের প্রতি মনোনিবেশ করিলে, যে আমাদের সম্মুখে ভয়ানক বিভীষিকা দেখাইয়া দেয়,; সেই আকর্ষণকেই আমরা ভৌতিক মোহ বলিয়া জানি। সুখই হউক, দুঃখই হউক, এ জগতে থাকিয়াই আমরা আশার দাস; মরিলে আত্মা থাকে কিনা কে বলিতে পারে? মন কোথা থাকিবে কে বলিতে পারে? যদি আত্মা, মনের অস্তিত্ব না থাকে তবে আশা করিয়া যে সুখ তাহা ফুরাইল; হৃদয়ে যেন কেমন একটা তীব্রভাবের উদয় হইল; সন্দেহচিত্তে অস্থিরের মত ঈশ্বরের নিন্দাবাদ করিলাম! যদি আত্মা, মনের অস্তিত্ব থাকে, তবে ভাবিয়া দেখিলাম, আশা করিয়া যাহাদ্বারা সুখভোগ করিব, মরিলে আর ভৌতিক পদার্থ নির্ম্মিত সে দেহ লইয়া আমি কখনও যাইতে পারিব না। আত্মা তখন ভোগাক্ষম হইয়া চলিয়া যাইবে। তবে পাঠক! কষ্টের সময় মরিয়া কি সুখ? আমি দারুণ কষ্টের সময়ও মরিতে চাহিব না। প্রজ্বলিত প্রায়ই হউক, স্তিমিত প্রায়ই হউক আশা লইয়া সংসারেই সুখ দুঃখের খেলা খেলিব। সুরবালা আবার বাঁচিতে চাহিলেন; অজিৎ, ভূপেন্দ্র, ও গিরিবালাকে লইয়া তাঁহার আবার সংসার খেলা খেলিতে সাধ হইল। কিন্তু নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁহার সে সাধ পূরাইতে দিল না। সুরবালার মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল, তাঁহার চক্ষু স্থির হইল। গিরিবালাকে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত করিয়া, অজিৎকে আত্মগ্লানি-অনলে নিক্ষেপ করিয়া, সুরবালার জীবন দেহ ছাড়িয়া উড়িয়া গেল; গৃহ আর্ত্তস্বরে নিনাদিত হইয়া উঠিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

হৃদয়ের জ্বালা।

পৃথিবী হইতে সুরবালার নাম লোপ হইয়া গেল। অজিৎ সিংহকে আত্মগ্লানি দিবানিশি দগ্ধ করিয়া তুলিল। তিনি আর মনুষ্য আলয়ে অবস্থান করিতে পারিলেন না। ভূপেন্দ্রের নিকট কামক্ষ্যা গমনাভিলাষ জানাইয়া বলিলেন "ভূপেন্দ্র, আমি কামক্ষ্যাতে হেমপ্রভার পিতার অন্বেষণ করিতে চলিলাম। হেমপ্রভাকে আর সঙ্গে লইতে সাহস হয় না। তাহাকে আপাততঃ এখানে রাখিয়া যাইতেই ইচ্ছা করিয়াছি। সুরবালার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত তোমাকে ও গিরিবালাকে এখানে অবস্থান করিতে হইয়াছে; তৎপর যে পরামর্শ হয় করা যাইবে।" ভূপেন্দ্র পিতাকে অতি শিশুকালে দেখিয়াছেন; তিনি এতদিন জীবিত ছিলেন কিনা জানিতেন না। এত দিনের পর পিতাকে পাইয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে তাঁহার কষ্ট হইল; তিনি পিতাকে বলিলেন "আপনি এত শীঘ্র যাইতেছেন কেন?"

অজিৎ। আমি এখন কামক্ষ্যাতে না গেলে, যদি বন্ধুবর তান্তিয়া টোপী সেখানে যাইয়া থাকেন, তিনি মনে কি করিবেন? হেমপ্রভা তাঁহার একমাত্র অবলম্বন, তাহাকে না দেখিয়া হয়ত তিনি নিতান্ত অস্থিরই হইয়াছেন।

ভূপে। এখন কয়েকদিন এখানে থাকিয়া একটু বিশ্রাম লাভ করুন।

অজিৎ। "বৎস! আমার আর মনুষ্যসমাজে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। পাপের বিষময় ফল আমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ করিতেছে।

তোমার হতভাগা পিতার জন্যই তোমার মা"—এই কথা বলিতে অজিতের চক্ষে জল আসিল।

ভূপে। পিতঃ! গত বিষয় মনে করিয়া কেন কষ্ট পান?

অজিৎ। ভূপেন্দ্র গত বিষয় আর মনে করিতে হয় না। সেই অনল দিবানিশিই আমার মনে জাগরুক রহিয়াছে। তোমার মাকে আমিই বধ করিয়াছি; সুরবালার মৃত্যুর কারণও আমি। ভূপেন্দ্র, আমি তোমার মাতৃহন্তা, তোমার নিকট অমার্জ্জনীয়—পৃথিবীর ঘৃণিত, মনুষ্য সংসারে থাকিবার অযোগ্য। ভূপেন্দ্র, গিরিবালার তুমি ভিন্ন সংসারে আর কেহ রহিল না, তাহাকে অবজ্ঞা করিও না।" ভূপেন্দ্র একটু হাসিলেন এবং মনে মনে বলিলেন "গিরিকে এত দিন পরের বালিকা বলিয়া জানিতাম; তাহাতেও তাহাকে স্নেহ করিয়াছি; এখন যথার্থ ভগ্নী জানিয়া তাহাকে তুচ্ছ করিব?" তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন "এমত কে আছে, যে, সে স্নেহ প্রতিমাকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারে? গিরি আমার একমাত্র ভগ্নী, তাহাকে আমি দেখিব না, তবে কি আমি পশু?"

গিরিবালা এত দিনে জানিল তাহার পিতা কে, ভূপেন্দ্র তাহার কিরূপ দাদা। ভূপেন্দ্রও জানিলেন গিরি তাহার যথার্থ ভগ্নী। যে দিন সুরবালার মৃত্যু হইল; যে দিন গিরিবালা নিজের জন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারিল; সেই দিন হইতে গিরির মনে আসিয়া একখানা মেঘ উদিত হইল। মাতার চিন্তা ভিন্ন তাহার মনে আরো যেন কি চিন্তা সর্ব্বদা ক্রিয়া করিতে লাগিল। মুখে নিরাশার চিহ্ন যেন স্পষ্ট ভাসিতে লাগিল। গিরিবালা এখন সর্ব্বদা পিতার কাছে থাকে এবং তাঁহার অবস্থান বার্ত্তা ইত্যাদি নানা কথা জিজ্ঞাসা করে। ভূপেন্দ্র ও অজিৎ যেখানে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, গিরিবালা ও হেমপ্রভা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

গিরিবালা সেখানে সহজে আসিতে পারিল, কিন্তু হেমপ্রভা যেন কিছু সঙ্কুচিত হইল।

অজিৎ। "হেমপ্রভা, আমি এখন তোমার পিতার অনুসন্ধানে চলিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, পুনরায় আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব। সেপর্য্যন্ত তুমি এই বাড়ীতেই অবস্থান কর।" গিরি-বালাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "গিরি, তোমার দাদাই এখানে রহিল, তোমার সম্বন্ধে যাহা করিতে হয় সেই করিবে।"

অজিতের মন এরূপ উতলা হইয়াছিল যে, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। গিরিবালা ও অন্যান্য সকলের অনুরোধ ব্যর্থ হইল; আর কিছু না বলিয়াই তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলেন। ভূপেন্দ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতক দূরে চলিয়া গেলেন। হেমপ্রভা ও গিরিবালা অজিৎ যে পথে চলিয়া গেলেন; কতক্ষণ সে দিকে চাহিয়া রহিল; পরে উপবেশন করিয়া কথোপকথনে নিযুক্ত হইল। কতক্ষণ আলাপের পর গিরিবালা হেমপ্রভাকে বলিল "ভগ্নি! তুমি তোমাদের লুমাতে অবস্থানের কথা যেরূপ বলিয়াছ, আমার ইচ্ছা হয় সেরূপ নির্জ্জন স্থানে যাইয়া থাকি।"

হেম। কেন ভাই গৃহে থাকিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না?

গিরি। সকলের হইতে পারে আমার যেন হয় না।

হেম। "শশিশেখরের নিকট থাকিলে তোমার যে সুখ, বনে সে সুখ কোথায় পাইবে?" গিরিবালা একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল "সুখ? পৃথিবীতে আমার ন্যায় লোকের কি সুখ হইতে পারে? শশি-শেখর দেবতা, আমি নরক" এই বলিয়া গিরিবালা উঠিয়া গেল; হেম-প্রভাও বিস্মিত হইয়া তাহার পশ্চাৎ চলিয়া গেল।

—:০:—

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

আত্মবধ।

সুরবালার শ্রাদ্ধ যথাসময়ে সম্পন্ন হইয়া গেল; কিন্তু গিরিবালার হৃদয়ের মেঘ,—মাতার মৃত্যুর পর হইতে যে মেঘে যুবতীর অন্তরও বহির্দ্দেশ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল; যে মেঘ অকালে তাহার শারদ গগন সদৃশ নির্ম্মল হৃদয় আকাশে উদিত হইয়া, তাহার সুখপথ সমূহ আঁধার করিয়া ফেলিল, তাহা অপসৃত হইল না; বরং দিন দিন উহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহার ভাসমান ও প্রখর বুদ্ধি ব্যঞ্জক প্রশস্ত স্থিরনয়নদ্বয় ক্রমশঃ কোটরগত হইতে লাগিল। সুগোল গোলাপাভ গণ্ডদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়িল; তদুপরিস্থ অস্থি ভাসিয়া উঠিল। এখন তাহার মুখে হাসি দেখা যায় না। যদিও কখন দেখা যাইত; তাহা হৃদয়ের প্রফুল্লতা প্রকাশ না করিয়া, ঘোর মর্ম্মান্তিক কষ্টেরই পরিচয় দিত। গিরিবালা বাল্যকাল হইতেই চিন্তাশীলা,এখন চিন্তাই তাহার একমাত্র সহচরী হইল। শীতঋতুর সমাগমে প্রকৃতির যে অবস্থা হয়, সে দৃশ্য দেখিলে দর্শকের বিরক্তি হয় না, দুঃখ হয়। তদ্রূপ বিষাদের অত্যাচারে মনুষ্য সৌন্দর্য্য বিকৃত হইলে, তাহা দেখিয়া লোকের মনে দুঃখ ভিন্ন কি হইতে পারে? বিষাদ এখনএকাদিক্রমে এবং অবিরোধে গিরিবালার অপরিসীম সৌন্দর্য্যের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। ইহা দেখিয়া সকলেরই কষ্ট হইল; কিন্তু শশিশেখর মর্ম্মে দারুণ আঘাত পাইলেন। মাতৃশোকই এই বিষাদের কারণ বলিয়া তিনি অনুমান করিলেন; কিন্তু দিন ত চলিয়া যাইতেছে, তবে কেন এ মুখশশী রাহুগ্রাস মুক্ত হইতেছে না? শীতের পর

বসন্ত, রাত্রির পর দিবা, নিদ্রার পর জাগরণ, তবে কেন বিষাদের পর প্রফুল্লতা হইবে না? শশিশেখর গিরির অবস্থা সর্ব্বদা ভাবিতেন, পাছে তাহার শোক উথলিয়া উঠে, এই ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না।

সুরবালার মৃত্যুর পর সকলেই জানিতে পারিয়াছে গিরিবালা বিধবার কন্যা। রঘুপতির চিরপোষিত সঙ্কল্প মন হইতে উঠিয়া গেল। এ দৃঢ় প্রোথিত সঙ্কল্প মন হইতে উঠাইতে, দয়ালু রঘুপতির বড় কষ্ট হইল। হিন্দুসন্তান হইয়া তিনি কিরূপে হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে কাজ করিবেন? তিনি গ্রামস্থ একটী ভদ্র-কন্যার সহিত শশিশেখরের সম্বন্ধের প্রস্তাব করিলেন। শশিশেখর এ কথা শুনিলেন; নানাপ্রকার ভাব আসিয়া যুগপৎ তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল। একদিকে পিতার ইচ্ছা ও হিন্দুসমাজ, অন্যদিকে তাহার জাগ্রতাবস্থার চিন্তা এবং নিদ্রার স্বপ্ন গিরিবালার অকৃত্রিম, অতুল্য এবং অসীম প্রণয়। যে প্রণয়ের গভীরতা অতলস্পর্শ, বেগ অনিবার্য্য এবং ব্যাপ্তি হৃদয়ময়, সে অমানুষী প্রণয়ের আশা শশিশেখর কিরূপে ত্যাগ করিবেন? পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের আঘাতে তাঁহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইল; তাঁহার বুদ্ধি বিচলিত হইল। অবশেষে স্থির করিলেন, যাহা ঘটুক তিনি গিরিবালাকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

এ কথা গিরিবালারও জানিতে বাকি রহিল না। ইহা সে স্থিরভাবে শুনিল এবং স্থিরভাবেই সহ্য করিল। গিরিবালা এ অসহ্য কষ্ট সহ্য করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল; তাহার মনের কোন নূতন ভাব প্রকাশ পাইল না। একদিন গিরিবালা এক প্রকোষ্ঠ জানালায় বসিয়া, তাহার ভূত, বর্ত্তমান, এবং ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিতেছে; হস্তোপরি গণ্ড বিন্যস্ত; হৃদয়ের আমূল প্রদেশ হইতে দীর্ঘনিশ্বাস

বাহির হইতেছে, এমত সময় শশিশেখর আসিয়া সে গৃহে প্রবেশ করিলেন। গিরিবালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এবং গণ্ড হইতে অযত্নবিন্যস্ত কৃষ্ণকেশ দাম সরাইয়া দিয়া বলিলেন "গিরি, এ সুন্দর মুখে কি আর হাসি দেখিব না?"

গিরি। এ পৃথিবীতে কি সকলেই হাসিতে পারে?

শশি। সকলে পারে কিনা জানি না; তুমি কেন হাসিবে না? বল, বল, কি হইয়াছে, কিজন্য তুমি দিবারাত্রি এত ভাব?

গিরি। আমি ভাবিব না? আমি ভাবিব না? তবে আর কে ভাবিবে?

শশি। ভাবনার তোমার যে কারণ রহিয়াছে, তাহাত সকলের পক্ষেই ঘটে। চিরদিন কেহ মাতৃস্নেহ ভোগ করিতে পারে না।" শশিশেখরের মুখে মাতৃ শব্দ শুনিয়া, যুবতী চমকিয়া উঠিল; কিসে যেন তাহার হৃদয়ে দংশন করিল। গিরিবালা স্থির দৃষ্টিতে একবার যুবকের মুখপানে চাহিল এবং কয়েক ফোঁটা জল তাহার চক্ষু হইতে পড়িল; অমনি উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিল "হে দুর্ব্বলের বল! আমার হৃদয়ে বল দাও। আমার স্বার্থের হানি হইল বলিয়া মাতাকে ঘৃণা করিব? সে জঘন্য ভাব মনে হইবার পূর্ব্বেই যেন, আমার দেহের একটা পরমাণু পর্য্যন্ত এ পৃথিবী হইতে লোপ হইয়া যায়" যুবতীর হৃদয়ের এই বিষময় উচ্ছাস দর্শনে যুবক অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সহজেই আবার সে ভাব, সে অনিবার্য্য উচ্ছাস গিরিবালার নিকট হইতে বিদূরিত হইল; স্বাভাবিক গভীরতা এবং অবিচলিত চিত্ততা আজ্ঞামাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। গিরিবালা ধীরস্বরে শশিশেখরকে বলিল "শশি, আমার জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়াছ; হতভাগিনী মার শোচনীয় মৃত্যু স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছ; তবু বলিতেছ অন্যাপেক্ষা আমার

অধিক কষ্টের কারণ নাই? যে দিন মাতৃহীন হইয়াছি, সে দিন কেবল মাকে হারাই নাই; মাতার সহিত সমাজের অধিকারও হারাইয়াছি।”

শশি। তুমি কেন এ নিষ্ফল চিন্তা করিয়া বৃথা শরীর নষ্ট করিতেছ? তোমার মুখ কালিমাময়, শরীর শীর্ণ, বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। তোমার মনে স্ফূর্ত্তি নাই, কার্য্যে উৎসাহ নাই, অধরে হাসি নাই, তুমি কি দেখিতেছ না তোমার শরীরের অবস্থা কি হইয়াছে? সৌন্দর্য্যের কি হইয়াছে?

গিরি। সৌন্দর্য্য দিয়া কি হইবে শশি?

শশি। সৌন্দর্য্যে, শরীরে তোমার অবজ্ঞা হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে যে, এক জনের মনে কি কষ্ট হয়, তাহাও অন্ততঃ তোমার মনে রাখা উচিত। তোমাকে অসুখী দেখিলে যে, আমার কি পর্য্যন্ত মর্ম্মান্তিক কষ্ট হয়; তোমার সুখ দুঃখের সহিত যে, আমারও সুখ দুঃখের নিতান্ত সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা তুমি জান। আমার সুখও একবার ভাবিয়া দেখিতে পার।

গিরি। তোমার সুখের জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি। কিন্তু শশি, পূর্ব্বভাব এখন মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়।

শশি। কেন, কেন উচিত নয়? তোমার কথার অর্থ যে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

গিরি। আমার জন্মবৃত্তান্ত কি ভুলিয়াছ?

শশি। তুমি কি মনে করিতেছ, তাহাতে এ হৃদয়ের গতি ফিরিবে? যদি এরূপ মনে করিয়া থাক, তবে গিরি, মনে বড় কষ্ট পাইলাম।

গিরি। আমি সকলই জানি, তোমার পিতা কেন তোমাকে বিধবার কন্যা বিবাহ করিতে দিবেন?

শশি। তিনি অবশ্য করাইবেন; তাঁহার একমাত্র পুত্রকে তিনি স্বহস্তে বলিদান করিতে পারিবেন না।

গিরি। এ তোমার বুঝিবার ভুল, তোমার বিবাহের যে প্রস্তাব হইতেছে।

শশি। "তাহা আমি শুনিয়াছি, তিনি ততদূর বিবেচনা করেন নাই। আমি যখন তাঁহাকে বলিব; তিনি অবশ্য বুঝিবেন, অবশ্য আমার অনুরোধ রাখিবেন। তিনি দয়ালু, পদতল পতিত পুত্রকে কথনও ঠেলিতে পারিবেন না।" গিরিবালা একবার একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল, "লোকের ইচ্ছামতই যদি সকল কার্য্য হইতে পারিত, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে কাহাকেও মনোকষ্টে থাকিতে হইত না।"

শশি। "যদি নিতান্তই তিনি অসম্মত হন, তাঁহার অমতেই আমি তোমাকে বিবাহ করিব। পিতার অবাধ্য হইতে পারি, পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি না।" এই কথা বলিতে তাঁহার স্বর কম্পিত হইল; নয়নদ্বয় জ্যোতিষ্মান হইল; অধীরতার সহিত গিরিবালার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন "এ পৃথিবীতে এমন কি আছে, স্বর্গে এমন কি আছে, যাহা তোমা হইতে আমাকে বিচ্যুত করিতে পারে?" শশিশেখরের এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং আগ্রহ দর্শনে গিরিবালার স্থির সঙ্কল্প বিচলিত হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু সে ক্ষণিক পরিবর্ত্তন মাত্র; পুনরায় হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া বলিল "পিতার অবাধ্য হইয়া এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে? ছি, শশি, এরূপ বাক্য তোমার মুখ হইতে শুনিব, এরূপ কোন দিনও ভাবি নাই।"

শশি। আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছি না। কিন্তু যদি তিনি আমাকে ত্যাগ করেন সে কষ্টও সহ্য করিব।

গিরি। তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। হিন্দু-সমাজে থাকিয়া, তিনি কখনো আমাদের বিবাহে সম্মতি দান করিতে পারেন না।

শশি। হিন্দুসমাজ লইয়া তিনি কি করিবেন? তিনি কি তাঁহার একমাত্র পুত্রের সুখের জন্য অন্যায় সমাজকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না?

গিরি। অসম্ভব; সংসারী হইয়া মনুষ্যের পক্ষে সমাজ ত্যাগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে সংসারে থাকিতে চাহিবে, সৎই হউক বা অসৎই হউক একটা না একটা সমাজ লইয়াই তাহাকে থাকিতে হইবে। বনবিহারী উদাসীন ভিন্ন সমাজ ত্যাগ অন্যের সম্ভবে না।

শশি। পিতা না হয় তাহাই করিবেন।

গিরি। শশিশেখর, মনের দুর্দ্দমনীয় ভাব ত্যাগ কর। সপরিবারে কে কবে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারিয়াছে? মনে আর এ অনুচিত আশাকে স্থান দিও না। তোমার পিতা বুদ্ধিমান; দয়ালু, যদি বিশেষ উপায় থাকিত, তিনি এ কাজে কখনও অসম্মত হইতেন না। এ কার্য্য কি হিন্দু ধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধে হইবে না? যদি একান্তই আমাকে বিবাহ কর, তবে শশি, তোমাকে তোমার পিতাকে ত্যাগ করিতে হইবে। অনুচিত কার্য্যে প্রত্যেকেরই ক্রোধ হইতে পারে। তিনি হয়ত মনোকষ্টে বিরক্ত হইয়া, সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তীর্থ-বাসী হইবেন। তাহা হইলে শীঘ্রই তোমাকে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় পড়িতে হইবে। যে কার্য্যের পরিণাম সমাজ ত্যাগ, পিতৃত্যাগ, দারিদ্র্যা-বলম্বন, সে কার্য্য করা কি উচিত? আমার ভালবাসা কি এত স্বার্থপর যে, নিজের সুখের জন্য তোমাকে এ অনুচিত কার্য্য করিতে দিব? আরো ভাবিয়া দেখ, যদি অপরিণামদর্শীর ন্যায় তুমি এরূপ কার্য্য কর, তোমার সন্তান সন্ততির কি দশা হইবে। তাহারা সমাজে স্থান পাইবে

না; পিতা মাতার নিন্দাবাদে লজ্জিত হইবে; দরিদ্রতার ভীষণ পীড়নে সর্ব্বদা পীড়িত হইবে। দরিদ্র পরিবার সৃজন করা বিধাতার ইচ্ছা নয়। স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ; এই পরিণামের দিকে চাহিয়াও বুঝিতে পারিবে যে, তোমার সহিত আমার বিবাহ হওয়া বিধাতারও সম্পূর্ণ অনিচ্ছা।

শশি। গিরিবালা, সমুদয় সহ্য করিব, বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া, যদি সহস্র সহস্র পাপভারও মস্তকে বহন করিতে হয় তাহা করিব, কিন্তু গিরিবালা, এ আশাকে হৃদয় হইতে কখনও উৎপাটিত করিতে পারিব না।

গিরি। শশি, তা তুমি কখনও পারিবে না। আরও বলি, শোন, তোমার সহিত আমার বিবাহ হইলে, মার কলঙ্ক লোক সমাজে রহিয়া যাইবে। আমাকে লক্ষ্য করিয়াই লোকে মার কলঙ্ক নির্দ্দেশ করিবে। তুমিও লোকের নিকট ঘৃণনীয় হইবে। আমাদের বিবাহ মাতৃ কলঙ্ককে জাজ্বল্য রূপে লোকের নয়ন সমীপে ধরিবে; ইহা লোকের উপহাসের কারণ হইবে। এ হতভাগিনীকে গর্ভে ধারণ করিয়া, মৃত্যুর পরও কি মার কলঙ্ক পৃথিবী হইতে লোপ হইবে না? হতভাগিনীর সুখ সাধনই কি তাঁহার কলঙ্ক প্রকাশের কারণ হইবে? শশিশেখর, তুমি বুদ্ধিমান, তবে কেন বালকের ন্যায় অধীর হইতেছ? বৃদ্ধ পিতার মনে কষ্ট দিও না, হিন্দু সমাজের অবমাননা করিও না। এ পৃথিবীতে থাকিয়া তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে না।

শশি। গিরিবালা, গিরিবালা, তুমি কি একবার ভাবিয়া দেখিতেছ না, তুমি কি বলিতেছ? এ কি সম্ভব, তুমি আমাকে ত্যাগ করিতে পারিবে? ইহাতে কি তোমার অসহ্য কষ্ট হইবে না?

গিরি। সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর শশি? তোমার মঙ্গলের

জন্য, মাতৃ কলঙ্ক লোপের জন্য সকল সহ্য করিব। তোমার অপরিসীম দৈবী ভালবাসা ভাবিয়াই সুখী থাকিব। যদি না পারি বরং হৃদয় ফাটিয়া যাইবে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আর তুমি, পৃথিবীতে অনেক বিষয় আছে, যাহাতে মনোনিবেশ করিয়া, তুমি আমাকে ভুলিতে পারিবে। অনন্ত কার্য্যক্ষেত্র তোমার সম্মুখে বিস্তৃত; তাহাতে অবতরণ করিলে আমাকে চিন্তা করিবারও অবসর পাইবে না। ধন, মান, যশ, পুরুষের পক্ষে স্পৃহণীয় আরও কত বিষয় রহিয়াছে। সে সকল লাভ করিয়া সুখী হও, আমি এ কথা শুনিয়া সুখী হইব।

শশি। ধন, মান, যশ, এ সকলে আমি পদাঘাত করি। বল একবার বল, তুমি কেবল আমার মন পরীক্ষা করিবার জন্য এইরূপ বলিতেছ। তোমার একটী মাত্র কথার জন্য আমি পৃথিবী, স্বর্গ, সমস্ত সৌরজগত পরিত্যাগ করিতে পারি; ইহকাল, পরকাল, সব বিনাশ করিতে পারি।

গিরি। "ছি, শশি, তুমি পাগল, ধীর প্রকৃতি হইয়া কেন বালকের ন্যায় চঞ্চল হইতেছ? এ জীবনে আমি তোমাকে আশা করিতে পারি না। এ পৃথিবী আমাদের সম্মিলনের জন্য নয়" এই বলিয়া গিরিবালা একটু নীরব হইল। আবার শশিশেখরের হস্ত ধারণ করিয়া, অতি কোমল, অতি স্নেহ ব্যঞ্জক স্বরে বলিল "শশি! তোমাকে আমার একটী অনুরোধ রাখিতে হইবে। তোমার পিতা যখন তোমার সম্বন্ধ স্থির করিবেন, তখন বিবাহে অসম্মত হইও না। তিনি অবশ্য তোমার জন্য সৎপাত্রীই অনুসন্ধান করিবেন। যে অপরিমিত ভালবাসা তুমি আমাতে ন্যস্ত করিয়াছ, তাহা সেই বালিকাকে সমর্পণ করিতে চেষ্টা করিও।

শশি। "গিরিবালা, আজি তুমি আমাকে এ কথা বলিলে?" শশিশেখরের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল; তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে

লাগিল। গিরিবালা শশিশেখরের হাত ধরিয়া বলিল "শশি, প্রিয়তম, কাঁদিও না, আমাকে ভুলিতে শিখ। হতভাগিনীকে ভাবিয়া কষ্ট পাইও না।" গিরিবালা আর বলিতে পারিল না, শশিশেখরের হাত ছাড়িয়া দিয়া, চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে তথা হইতে বাহির হইয়া আসিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহত্যাগ।

নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়া, নিজের মৃত্যু নিজে ডাকিয়া আনিয়া, অধীরা বিবশা বালিকার ন্যায় গিরিবালা কাঁদিতে লাগিল। আজি তাহার হৃদয়ের স্থিরতা—যে স্থিরতা বলে গিরিবালা অদ্য অকুণ্ঠিত ভাবে আপনার মৃত্যু আপনি ব্যবস্থা করিল; যে স্থিরতা অল্পক্ষণ পূর্ব্বে শশিশেখরকে স্তম্ভিত করিয়াছিল; সে স্থিরতা—সে অমানুষী হৃদয়ের স্থিরতা আজি কোথায়? জগৎ সৃষ্টি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, পার্থিব সকল বস্তুরই শক্তি সীমাবদ্ধ এবং পরিমিত। শক্তি সম্পূর্ণ প্রয়োগে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, অধিক দূর যাইতে পারে না। সীমা অতিক্রম করিবার চেষ্টা কর, শক্তির আধার ভাঙ্গিয়া যাইবে। অদ্য গিরিবালার হৃদয় বলের সম্পূর্ণ পরীক্ষা হইয়াছে; কাজেই তাহা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। আজি আর হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না; বিছানায় শুইয়া, উপাধানে মুখ রাখিয়া গিরি কাঁদিতে লাগিল। জগতে এমন কি আছে, যাহার দিকে চাহিয়া সে এ যন্ত্রণা—এ অসহ্য যন্ত্রণা ভুলিবে? হে বিধাতঃ! সংসার এরূপ করিয়া সৃষ্টি করিলে কেন? এ

পৃথিবীতে থাকিয়া, যদি আমরা কেবল আপনাদের জন্যই ভুগিতাম তাঁহা হইলে কাহার আপত্তি থাকিত ? কিন্তু আমরা পরের জন্য, মৃত্যুর পর যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, এরূপ সন্দেহ পূর্ণ সেই পর কে আপন ভাবিয়া, তাহার জন্য ভুগি কেন ?

হেমপ্রভা শয্যাগৃহে আসিয়া দেখে, গিরিবালা শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। হেমপ্রভা ডাকিল "গিরি !" গিরিবালা নীরব, তাহার কথার উত্তর করিতে পারিল না। সে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "ভগিনি ! চুপ করিয়া রহিলে কেন ? একবার কথা কওনা।" গিরি হেমপ্রভার নিকট কিছু বলিতে পারিল না ; ভাবিল মনের বেগ তাহার নিকট গোপন করিবে। কিন্তু ভগ্নহৃদয়া গিরি আবারো কাঁদিতে লাগিল। হেমপ্রভা গিরিকে কাঁদিতে দেখিয়া, তাহার অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া, অঞ্চল দ্বারা চক্ষু জল মুছাইয়া বলিল, "গিরি কাঁদিতেছ কেন ? আজি তোমার কোমল হৃদয় কিসে ব্যথিত হইল ?" গিরিবালার এক বার মনে লইল হেমপ্রভা ভিন্ন তাহার মরমের সখী আর কেহ নাই ; তাহাকে হৃদয়ের দারুণ বেদনা ভাঙ্গিয়া বলে। বলিতে কিছু অপমান বোধ হইল, বলিয়াই বা কি হইবে ? এ বেদনার গভীরতার পরিমাণ অন্য কেহ বুঝিবে না। বিশেষতঃ হেমপ্রভা তাহার প্রাণের ভগিনী ; এ কথা শুনিলে সে নিতান্ত ব্যথিত হইবে। এমন কি, হেমপ্রভা একথা শুনিলে তাহাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা পাইবে। আর না হয়, তাহার স্থিরীকৃত সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিবে ! গিরিবালা ত ইহার কিছুই চায় না। তাই ভাবিল এ দুঃখ কাহাকেও বলিবে না। গিরি হেমপ্রভাকে বলিল "হেম, আজি মাকে মনে করিয়া বড় কষ্ট হইতেছে।" হেমপ্রভা কিছু জানে না, কিছু শুনে নাই, সে তাহাই বুঝিল। হেমপ্রভা সখির দুঃখে কাতর হইয়া বলিল "তিনি স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহার জন্য

আক্ষেপ করায় ফল কি? 'সেই রাজ্যে যে যায় সে আর ফিরিয়া আসে না। ভগিনি! কাঁদিলে কি আর তাঁহাকে পাইবে?" গিরিবালার নিরাশা মথিত কোমল সরল হৃদয়ে মাতৃশোক উথলিয়া উঠিল। সে আরো কাঁদিতে লাগিল। হেমপ্রভা আবারো প্রবোধ দিতে লাগিল। যাহার অন্তরে বহ্নি হুহু করিয়া জ্বলিতেছে; কেবল এক ধনে বঞ্চিত হইয়া যাহার সমস্ত সুখ ফুরাইয়াছে, এ সামান্য জলসিঞ্চনে তাহার কি শান্তি হইবে? হেমপ্রভা গিরিবালার মর্ম্মাঘাত বুঝিতে পারিলে তাহাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিত? সে নীরবে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল। গিরিবালা ধীরে ধীরে বলিল "হেম! তুমি নিদ্রা যাও, আমার যাতনার অনেক উপশম হইয়াছে।"

হেম। তুমিই নিদ্রা যাইতে চেষ্টা কর, আমি তোমাকে বাতাস করি।

গিরি। "বাতাসের আবশ্যকতা নাই। এস দুজনেই নিদ্রা যাই।" হেমপ্রভা একথা শুনিয়া বড় সুখী হইল। সে শয্যায় শয়ন করিলে পর, গিরিবালাও নিদ্রার ভান করিয়া চুপ করিয়া রহিল। গিরিবালাকে নিদ্রিত ভাবিয়া হেমপ্রভাও নিদ্রা গেল।

প্রিয় পাঠক দেখ আজি এক পালঙ্কোপরি এক শয্যায় দুইটী যুবতী কুসুম দুইটী বিভিন্ন হৃদয় লইয়া শুইয়া আছে। সুখাশা একের সম্মুখে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া, তাহার হৃদয় নাচাইতেছে। তাহার হৃদয়ে শান্তি বিরাজমান, সে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তাহার নিদ্রাকুলিত মুখেও যেন হাসিয়রছায়া চিত্রিত। অপরের নিকট হইতে নিরাশা স্বর্গ কাড়িয়া লইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাকে অপদার্থ করিয়া তুলিয়াছে। সে যাতনা নিষ্পেষিত ও মর্ম্মপীড়িত হৃদয় লইয়া পড়িয়া আছে। নিদ্রাও সে উভয়ে উভয়কে স্পর্শ করিতেছে না। গিরিবালা এক একবার দেখিতেছে

হেমপ্রভা নিদ্রা যাইতেছে কি না। রজনী যখন তৃতীয় প্রহর, তখন গিরিবালা দেখিল হেমপ্রভা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছে। অমনি ধীরে ধীরে শয্যা হইতে নামিয়া, প্রকোষ্ঠান্তরে চলিয়া গেল।

গিরিবালা অন্য প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দীপ জ্বালিল এবং নিঃশব্দে বসিয়া একখানা পত্র লিখিতে লাগিল। লিখিতে লিখিতে চক্ষুজল গণ্ড বাহিয়া পড়িল। থামিয়া থামিয়া অনেকক্ষণ পরে গিরিবালা পত্র লিখিয়া সমাপন করিল। একবার পত্রখানা নিজে পড়িল; পরে দীপ নির্ব্বাণ করিয়া; পুনরায় শয্যাপ্রকোষ্ঠে আসিল; আসিয়া পত্রখানা হেমপ্রভার অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিল। হেমপ্রভার শান্ত, নির্ম্মল, নিদ্রাচ্ছন্ন মুখের প্রতি কতক্ষণ চাহিয়া রহিল; অবশেষে ধীরে ধীরে বলিল "ভগিনী হেমপ্রভা, চলিলাম।" বলিতে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, আর দাঁড়াইল না, গৃহ হইতে বাহির হইল। এক একবার মনে লইতে ছিল, শশিশেখরের দেবতা-নিন্দিত স্বর্গীয় মুখখানা এজন্মের তরে প্রাণভরিয়া একবার দেখিয়া যায়। সে মুখ দেখাত আর কপালে ঘটিবে না। সে মুখখানি— যে পবিত্র মুখখানি শেষ দিনের তরে দেখিবার প্রলোভন গিরিবালা সহজে ছাড়িতে পারিতেছে না। কিন্তু ভয়, পাছে শশিশেখর জাগিয়া উঠে; তাহা হইলেত সকলই বিফল হইবে। তাই সাহস হইল না, সত্বর পদে বাড়ী হইতে বাহির হইল। কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না, জানিল কেবল নৈশ মৃদুবায়ু সন্তাড়িত বৃক্ষাবলী, আর দেখিল কেবল অন্তরীক্ষ বাসী তারকাগণ।

গিরিবালাত চলিয়া গেল, কিন্তু শশিশেখর কি করিতেছেন? তিনি কি ঘুমাইতেছেন? না, পাঠক, অন্তরভেদী চিন্তা যার হৃদয়ে, সে কি ঘুমাইতে পারে? আজ তাঁহার প্রতি সকলই অপ্রসন্ন, নিদ্রা কেন প্রসন্ন হইবে? কিন্তু শশিশেখর এখনও নিরাশ হন নাই; তিনি ভাবিতে-

ছেন "গিরিবালা আমারই হইবে। এক্ষণ যাহাই বলুক না কেন, আজি না হয় কালি, কালি না হয় দুদিন পরে সে আমার অনুরোধ ছাড়াইতে পারিবে না; আমার ভালবাসা উপেক্ষা করিতে পারিবে না। সে কি বাস্তবিকই আমার ভালবাসা উপেক্ষা করে? প্রতিদানের অযোগ্য মনে করে? না, না, তা কখনই নয়। সে আমাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসে।" শশিশেখর এরূপ অনেক ভাবিল; কিন্তু হতভাগা সেই রাত্রিতে জানিতে পারিল না যে, তাঁহার হৃদয় পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী হৃদয় ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল।

——:o:——

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

রজনী প্রভাত হইল। হেমপ্রভা জাগিয়া শয্যা হইতে উঠিল; দেখিল গিরিবালা শয্যাতে নাই। তাহার অলঙ্কারগুলি শয্যাপার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। অলঙ্কার দর্শনে হেমপ্রভার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। সে পালঙ্ক হইতে নামিয়া গৃহের চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিল; কোথাও গিরিবালাকে দেখিতে পাইল না। সম্মুখ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দ্বার খোলা রহিয়াছে। প্রকোষ্ঠ মধ্যে একস্থানে দোয়াত ও কলম রহিয়াছে; অন্য এক স্থানে কয়েকখানা ছিন্ন কাগজ পড়িয়া আছে। হেমপ্রভা একখণ্ড কাগজ লইয়া দেখিল এক স্থানে লিখিত আছে। "প্রিয় ভগ্নী হেম!" হেমপ্রভা আর পড়িতে পারিল না। লেখা দেখিয়াই সে গিরিবালার লেখা বলিয়া চিনিতে পারিল। তাহার সন্দেহ

আরো বাড়িল; কিন্তু কিছু স্থির করিতে পারিল না। হঠাৎ অন্যমনস্কা হেমপ্রভার অঞ্চলে হাত পড়িল। অঞ্চলে যেন কি বান্ধা রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। খুলিয়া দেখে গিরিবালার পত্র; হেমপ্রভা শশব্যস্তে পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল। গিরিবালার পত্রে লিখিত ছিল। "প্রাণের ভগ্নী হেম, তুমি জান না কাল রাত্রিতে কেন কাঁদিয়াছিলাম; তোমার অমূল্য প্রবোধ বাক্য কেন আমাকে শান্ত করিতে পারে নাই। তুমি জান না কেন একদিন বলিয়াছিলাম বনে অবস্থান আমার নিকট সুখকর হইত। হেমপ্রভা, কালি তোমাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম। আমার কাঁদিবার কারণ আর কিছু নয়; আমার হৃদয় ফাটিয়া গিয়াছে। তুমি জানিয়াছ আমি সমাজ ঘৃণিত প্রণয়ের ফল। সমাজে আমার স্থান হইতে পারে না। আমার জীবন বৃত্তান্ত শুনিয়াছ, শশিশেখরের সঙ্গে এ হতভাগিনীর বিবাহ হইলে কত অমঙ্গল ঘটিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পার। লোকে দেবতায় মন দিয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। আমি না জানিয়া দেবতায় জীবন দিয়া মহা অপরাধ করিয়াছি। এ অপরাধের ফল মৃত্যু।" হেমপ্রভার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে আবার পড়িতে লাগিল, "হেম, আমার হৃদয়ের ব্যথা তোমাকে না বলিলে আর কাহাকে বলিব? ইচ্ছা ছিল কালই একথা বলি, কিন্তু তাহা হইলে তুমি কি আমাকে ছাড়িয়া দিতে? একবার মনে হইয়াছিল গৃহে থাকিব; তাহা হইলে শশিশেখরকেত দেখিতে পাইতাম। কিন্তু আত্মস্থৈর্য্যের প্রতি বিশ্বাস হইল না; বিশেষতঃ শশিশেখর অধীর। আমি জানি শশিশেখরের ভালবাসা পূর্ব্বমতই এ হতভাগিনীর প্রতি রহিয়াছে। সে সমাজ ত্যাগ করিবে, পিতার অবাধ্য হইবে, আমাকে কখনো পরিত্যাগ করিবে না। তাহা হইলে এ হতভাগিনীর জন্য তাহার বিশেষ

অমঙ্গল হইবে। যাহাকে হৃদয় মন দিয়া পূজা করিয়াছি, যাহাকে সুখী দেখিলে আমার আহ্লাদের সীমা থাকে না, তাহার অপমান আমি কখনও সহ্য করিতে পারিব না। গৃহে থাকিয়া তাহাকে সমাজে অনাদৃত হইতে, পিতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া তিরস্কৃত হইতে, এবং দরিদ্রতা দ্বারা নিষ্পেষিত হইতে কখনও দেখিতে পারিব না। আমার জন্য শশিশেখর কাঁদিবে, দাদা কাঁদিবে, হেমপ্রভা, তুমি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিও। আর তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, শশিশেখরের ও তোমাদের বিবাহ দেখিতে পারিব না, সে সংবাদ শুনিতে পাইব না। আর এক কথা—আমাকে তোমরা বৃথা অন্বেষণ করিও না। ভগ্নি! জীবনের তরে তোমাদের স্বর্গসহবাস ত্যাগ করিয়া চলিলাম। তোমাদের মঙ্গল চিরজীবন কামনা করি।” হেমপ্রভা গিরিবালার পত্র পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। একজন পরিচারিকা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল “কি হইয়াছে?”

হেম। সর্ব্বনাশ হইয়াছে; গিরিবালা পলায়ন করিয়াছে।

বাড়ী শুদ্ধ সকলে জানিল, গিরিবালা বাড়ী হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এ সংবাদ শুনিয়া, শশিশেখর উন্মত্তের ন্যায় দৌড়াইয়া আসিলেন। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “গিরিবালা কোথায়?” হেমপ্রভা গিরিবালার পত্র শশিশেখরের হাতে দিল। শশিশেখর পত্র পড়িয়া, ক্রোধ বিকম্পিত স্বরে বলিলেন “পিতা আমাকে বিবাহ করাইবেন, মৃত্যু!” ভূপেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শশিশেখর ভূপেন্দ্রকে বলিলেন “ভূপেন্দ্র, যাও, যাও আমার নিষ্ঠুর পিতাকে যাইয়া বল, তিনি সমাজ সম্মান লইয়া সুখী হউন, যদি গিরিবালাকে জীবিত পাই তবে গৃহে ফিরিয়া আসিব; নতুবা সংসারকে এই হইতেই বিসর্জ্জন দিয়া চলিলাম।” পিতার কি অপরাধ শশিশেখর তাহা বড় ভাবিয়া দেখি-

লেন না; তথাপি পিতার প্রতি এই কঠোর বাক্যগুলি প্রয়োগ করিলেন। শশিশেখর বেগে ছুটিয়া চলিলেন। ভূপেন্দ্র গিরিবালার পত্র পড়িতে ছিলেন, শশিশেখরকে যাইতে দেখিয়া বলিলেন "শশিশেখর অপেক্ষা কর আমিও যাইতেছি।" শশিশেখর আর কিছুই শুনিলেন না; বেগে চলিয়া গেলেন। পত্র পাঠ করিয়া ভূপেন্দ্রও গিরিবালার অন্বেষণে অন্য-দিকে বাহির হইলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

পর্ব্বত মূলে।

গিরিবালা রাত্রিতেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার এই কার্য্যে ভয় কিছুই বাধা সম্পাদন করিতে পারিল না। মনে দৃঢ় বিশ্বাস, বাড়ী থাকিলে শশিশেখর তাহার আশা কিছুতেই ছাড়িবেন না, তাহা হইলে শশিশেখরের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। গিরি স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া, যুবত্যনুচিত সাহসে ভর করিয়া, বাড়ী হইতে বাহির হইল। কোথায় যাইবে, কি করিবে, শশিশেখরের মঙ্গল চিন্তা পরায়ণা উন্মত্ত হৃদয়া গিরি তাহা একবারও ভাবিল না। যেখানে নির্জ্জন পথ পাইল, তদবলম্বনেই অবিরাম গতিতে হাঁটিতে লাগিল। গিরি পথ চিনিত না, ঘাট চিনিত না; চিন্তাকুল মানসে কোথায় যাই-তেছে তাহার স্থিরতা নাই। সমস্ত দিন হাঁটিতে হাঁটিতে প্রায় দিবসের শেষভাগে একস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্থানটীর তিনদিক ক্ষুদ্র পাহাড় খণ্ডে বেষ্টিত। যে পথ অবলম্বনে গিরি সেখানে আসিয়া পড়ি-য়াছে, সে পথ একটী পাহাড়ের শিরোভাগ অতিক্রম করিয়া চলিয়া

গিয়াছে। পথের দুই প্রান্তে নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ। একটী উচ্চ পার্ব্বত্য বৃক্ষ কতক গুলি শকুনি, গৃধ্র মস্তকে করিয়া পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া আছে। পথের অপরিচ্ছন্নতা নিবন্ধন বোধ হইতেছিল, সে পথে লোকের বিশেষ গমনাগমন নাই। কাষ্ঠজীবীরা কাষ্ঠ আহরণার্থে বনাকীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশে এই পথ প্রস্তুত করিয়াছে। বামপার্শ্বস্থ পর্ব্বত-খণ্ড অতিক্রম করিয়া দূরেই যে, এক প্রশস্ত পথ রহিয়াছে গিরি তাহা জানিত না। স্বাপদ নিপীড়িত সূর্য্যোত্তাপ শুষ্ক শাখাচ্যুত বৃক্ষপত্র সমূহের মর্ মর্ শব্দে গিরিবালা চমকিয়া উঠিতে লাগিল। নির্জ্জন প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষান্দোলনে তাহার বোধ হইতে লাগিল, কোন হিংস্র পশু তাহাকে বিনাশ করিতে আসিতেছে। কিন্তু গিরি নিজের মৃত্যু চিন্তা করিয়া বড় ভীত হইল না; বরং মনে ভাবিল মৃত্যু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিলে সমস্ত উৎপাত মিটিয়া যায়। দিবস ত চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু কল্পিত ব্যাঘ্র আসিয়া গিরিবালাকে বিনাশ করিল না। ক্রমে সূর্য্যরশ্মি হীন হইয়া পড়িল, গিরিবালারও শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। যুবতীর এমন ক্ষমতা নাই যে দুরারোহ পাহাড়খণ্ড অতিক্রম করিয়া কোথাও যায়। শশিশেখরের অবস্থা মনে করিয়া পশ্চাৎদিকেও ফিরিতে পারে না। গিরি বুঝিল যুবতী হইয়া গৃহের বাহির হইলে কি অবস্থায় পড়িতে হয়। উপরে নীলিম আকাশ, তিনদিকে নীলিম পত্র সুশোভিত বৃক্ষাবলী, বৃক্ষাবলীর মূল দেশে পর্ব্বতখণ্ড গিরির অবস্থা দেখিতে লাগিল। গিরিবালা ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া বলিল "মা," পর্ব্বত হইতে অমনি উত্তর হইল "মা।" গিরিবালা চারিদিকে চাহিল; কোথাও কিছু দেখিতে পাইল না। প্রাণের ভয় না থাকিলেও তাহার কোমল হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে একটু থাকিয়া আবারও বলিল "মা," অমনি পর্ব্বত হইতে আবারও উত্তর হইল "মা,"। বুদ্ধিমতি গিরি এতক্ষণে বুঝিল

প্রতিধ্বনিই নির্জ্জন প্রদেশে তাহাকে ভয় দেখাইতেছে। সে পুনরায় ঊর্দ্ধে চাহিয়া বলিল "মা, তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে? আমি যে কি কষ্ট পাইতেছি, তুমি কি দেখিতেছ না মা? আমাকে কোলে লও, আমি ত জীবনের ভার আর বহন করিতে পারি না।" এই বলিয়া গিরি কাঁদিতে লাগিল। আবার ঊর্দ্ধে চাহিয়া ভগ্নস্বরে বলিল "হে বিধাতঃ! তুমি শান্তিদাতা; তোমার নিকট ভিক্ষা, এ হতভাগিনীর দশা যাহাই কর, সেই অস্থির যুবকের মনে শান্তি প্রদান করিও! শশিশেখরের যেন কোন কষ্ট না হয়।" একটু থাকিয়া গিরি গাইতে লাগিল;—

কেন বিধি দুঃখময় করিলে সংসারে?
ডুবালে দুঃখিনী প্রাণ নিরাশা পাথারে।
কেন স্বর্গ দেখাইলে, দেখাইয়ে নাহি দিলে
কাঁদায়ে কি লাভ পেলে, অবলা দুর্ব্বলান্তরে?
কুমুদ যতন করে, নাহি পায় শশধরে
শৈবাল হইয়ে তারে, লভিব কেমন করে।
যাক্ প্রাণ যদি যায়, ক্ষতি না গণিব তায়,
বিধি ধরি তব পায়, দেখ হে শশিশেখরে।

গিরিবালা গান ক্ষান্ত করিয়াই মনের আবেগে বসিয়া পড়িল। নির্জ্জন অরণ্য প্রদেশ পুনরায় নীরব হইল।

ভূপেন্দ্রজিৎ সমস্ত দিন গিরিবালাকে অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু কোথাও কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে তিনি পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত, সীমাবর্ত্তী পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন; গীত-ধ্বনিতে গিরি তথায় আছে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অমনি দ্রুতপদে পর্ব্বত শিখর উল্লঙ্ঘন করিয়া, অরণ্য মধ্য দিয়াই গিরিবালার নিকট

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অরণ্যান্দোলনে অরণ্য পশু ভাবিয়া গিরি চমকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; এখন ভূপেন্দ্রকে দেখিয়া অবনত মস্তকে কাঁদিয়া ফেলিল। ভূপেন্দ্র তাহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন "গিরি, এ কাজ করিলে কেন? গৃহ হইতে চলিয়া আসিলে কেন?" গিরি শুধু নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

ভূপে। ভগ্নি! শশিশেখর ত তোমাকে অবহেলা করে নাই।

গিরি। সেই জন্যই গৃহত্যাগ করিয়া আসিলাম। শশিশেখর আমার আশা ত্যাগ করিতে পারিলে গৃহে থাকিতাম।

ভূপে। গিরি, ভগ্নি, এস, এস গৃহে ফিরিয়া যাই।

গিরি। দাদা ওকথা আর বলিও না, ভুবন গঞ্জে আর যাইব না! সেখানে গেলে শশিশেখরের সুখময় সংসারে মহা অনর্থ সংঘটিত হইবে।

ভূপে। গিরিবালা, শশিশেখর তোমার জন্য উন্মত্ত হইয়া বাহির হইয়াছে। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তোমার সাক্ষাৎ না পাইলে আর গৃহে ফিরিবে না।

গিরি। "আমি গৃহে গেলে সে আরও উন্মত্ত হইবে। হয়ত এখন কতক দিন মনের দুর্দ্দমনীয় বেগে আমাকে অন্বেষণ করিবে; পরে একটু শান্তিলাভ হইলে আপনিই গৃহে প্রতি নিবৃত্ত হইবে। দাদা, আমি কি স্বার্থের জন্য শশিশেখরের চিরসুখ ভঙ্গ করিব?" ভূপেন্দ্র আজি ভগ্নী গিরিবালার নিকট অবাক্ হইলেন। তিনি বুঝিলেন গিরি মর্ত্ত্যলোকের নয়; সে স্বর্গের রমণী। গিরির দুঃখে তাঁহার হৃদয় আরও ফাটিয়া গেল। তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "বিধাতঃ! স্বর্গসুখে কেন বিঘ্ন সম্পাদন করিলে?" গিরির চক্ষে পুনরায় জল আসিল। ভূপেন্দ্র একটু পরে বলিলেন "ভগ্নী, চল, এ অরণ্য মধ্যে আর অবস্থান করা কর্ত্তব্য নয়।" পরে উভয়ের পরামর্শে কামক্ষ্যা পিতার নিকট

যাওয়াই স্থির হইল এবং উভয়ে অরণ্য মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ভূপেন্দ্র গিরিবালাকে লইয়া এক প্রান্তর মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে হাঁটিতেছেন। এমত সময় তাঁহাদের পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে পিতার চরণে প্রণত হইলেন, উদাসীন জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা এসময় কোথা হইতে আসিলে?" গিরিবালার মস্তক অবনত হইল। ভূপেন্দ্র পিতাকে আনুপূর্ব্বিক সমুদয় অবস্থা শুনাইলেন। উদাসীন মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মৃত্যু! তুমি কি এ হতভাগাকে দেখিতেছ না?" এই বলিয়া গিরিবালাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "মা, তুমি যাহা করিয়াছ মানুষে তাহা পারে না। তোমার স্বর্গীয় হৃদয়ের সঙ্কল্পে আমি বাধাদিতে চেষ্টা করিব না। চল মা, অরণ্যে থাকিয়া তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়াই এ পাপ জীবনের শেষ করিব।" পিতার বক্ষে মাথা রাখিয়া গিরি আজি অনেক শান্তি লাভ করিল। উদাসীন ভূপেন্দ্রকে বলিলেন "ভূপেন্দ্র আমি নৌকা ভাড়া করিয়া গিরিকে লইয়া অবস্থান করি; তুমি কল্য যাইয়া হেমপ্রভাকে লইয়া এস।"

ভূপে। বাবা, আমি শশিশেখরকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়া কিরূপে আসিব?

অজিৎ। হাঁ, ঠিক বলিয়াছ। তবে আমি গিরিবালাকে লইয়া বারাণসী চলিলাম। শশিশেখর বাড়ীতে না ফিরিলে, তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাড়ীতে আনিও। প্রাণপণে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে ত্রুটি করিও না, সে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে হেমপ্রভাকে লইয়া বারাণসীতে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইও। বন্ধুবর তান্তিয়াটোপীর আর কোন সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাই নাই। কামক্ষ্যাতে তাঁহার গমন অসম্ভব ভাবিয়াই

তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। বারানসী যাইয়া তিনি কোথায় আছেন তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমি তাঁহার জন্য বড় ব্যস্ত আছি।” ভূপেন্দ্র অবনত মস্তকে পিতার আদেশে সম্মত হইলেন।

অজিৎ। “আর এক কথা তোমাকে বলিয়া দিই, কামক্ষ্যাতে তান্তিয়া টোপীর অনুসন্ধান পাইলাম না, এ কথা হেমপ্রভাকে বলিও না। সে নিতান্ত কাতর হইবে। অন্য কোন ভান করিয়া তাহাকে বারাণসী লইয়া আসিবে।” এই বলিয়া উদাসীন গিরিবালাকে লইয়া নদী অভিমুখে রওনা হইলেন। ভূপেন্দ্র সেই রাত্রিতেই ভুবনগঞ্জ চলিয়া গেলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

উন্মাদ।

অজিৎ সিংহ গিরিবালাকে লইয়া বারাণসী আসিয়া পৌছিলেন। তিনি ভূপেন্দ্রের আগমন পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। শূন্য হৃদয়া গিরি পিতার নিকট অবস্থান করিয়া, কথঞ্চিত প্রকৃতস্থ হইল। মার মৃত্যুর পর হইতেই যেন সে আপনার পরিণাম আপনি স্থির করিয়াছে। সে এখন তাহার ছিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিল। অন্যে হইলে পারিত না; গিরি মর্ত্ত্যলোক বিহারিণী দেববালা; দেবদুর্ল্লভ উপকরণ লইয়া তাহার হৃদয় গঠিত; সে জীবনের আশায়, পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গ সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিল। হৃদয়ে চিরদিনের তরে মহা

শ্মশান জ্বালিয়া, একমাত্র শশিশেখরের মঙ্গল চিন্তা করিয়াই হৃদয়ের শান্তি বিধান করিতে লাগিল। শশিশেখরের গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, আবার যাহাতে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করে, এ চিন্তাই এখন তাহার হৃদয়ের এক মাত্র চিন্তা।

ভূপেন্দ্রজিৎ পিতার নিকট হইতে ভুবনগঞ্জ আসিয়া, কতক দিন শশিশেখরের অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু প্রথমতঃ কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন না। পরে এক দিন অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, শশিশেখর উন্মত্ত বেশে এক বৃক্ষতলে পড়িয়া আছেন। তাঁহার শরীর কঙ্কালবৎ হইয়া গিয়াছে; মুখ শুকাইয়া এক বিকট বেশ ধারণ করিয়াছে। বিশেষ পরিচিত লোক ভিন্ন হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া কেহ চিনিতে পারে না। শশিশেখরের এ অবস্থা দেখিয়া ভূপেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহার সম্মুখে যাইয়া হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে তুলিলেন। শশিশেখর উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ভূপেন্দ্র চক্ষুজল মুছিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন "ভাই শশি, বিধাতার যেরূপ ইচ্ছা ছিল তাহাই হইয়াছে; তবে কেন বৃথা কষ্ট করিয়া শরীর নষ্ট কর? চল এখন গৃহে যাই।"

শশি। গিরিবালা কোথায়?

ভূপে। "সে কথার আর প্রয়োজন কি? তাহাকে বিস্মৃত হও; চল, এখন গৃহে যাই।" শশিশেখর অধিকতর উন্মত্ত ভাবে বলিলেন "কি বলিলে ভূপেন্দ্র; সে কথার আর প্রয়োজন কি? তবে কি গিরিবালা পৃথিবীতে নাই? গিরিবালা, এই হতভাগাকে দেখা দিবে না বলিয়াই কি একেবারে পৃথিবী হইতে পলায়ন করিলে?" শশিশেখরের চক্ষু হইতে দর দর জল পড়িতে লাগিল। ভূপেন্দ্রের হৃদয়ও যেন ফাটিয়া গেল; তিনি এখন বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন। এখন আর প্রকৃত

কথা না বলিলে নয়। তিনি শশিশেখরের হাত ধরিয়া পুনরায় বলিলেন "শশি, তুমি মানব দেহে দেবতা, তোমার ভালবাসা দেবলোকে নাই। ভাই, উতলা হইও না, গিরি জীবিতা আছে।"

শশি। সে কোথায়?

ভূপে। পিতা তাহাকে দেশ লইয়া গিয়াছেন।

শশি। গিরিবালা আমাকে ছাড়িয়া গেল?

ভূপে। ভাই, সে সমস্ত কথা এখন মন হইতে তুলিয়া ফেল। সে তাহার হৃদয়কে বলিদান করিয়াছে; সে তোমার আশা আর হৃদয়ে রাখে নাই। গিরি চির কুমারীব্রত অবলম্বন করিয়া, জীবন অতিবাহিত করিতে স্থির-সংকল্প করিয়াছে। শশিশেখর, গিরিবালা আমাকে অনুনয় করিয়া, তোমাকে বলিতে বলিয়াছে, তুমি আর তাহার জন্য কাঁদিও না। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ কর, এই ইচ্ছা ভিন্ন গিরির হৃদয়ে এখন আর অন্য ইচ্ছা নাই। শশি, সমস্ত সংসার এখন তাহার নিকট শ্মশান সদৃশ। তোমাকে প্রকৃতস্থ জানিলেই তাহার হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি হইবে। শশিশেখর, গৃহে চল, তোমার বিবাহের কথা শুনিলে গিরির সুখের সীমা থাকিবে না।

শশি। "ভূপেন্দ্র, ভাই, গিরি আমাকে গৃহে যাইতে বলিয়াছে? তবে চল ভূপেন্দ্র, তবে চল আমি গৃহে যাইব। গিরিবালাকে বলিও শশিশেখরের বিবাহ শয্যা শ্মশানক্ষেত্র। যাবৎ না সে শয্যায় এ দেহ শায়িত হইবে, তাবৎ সে গিরিবালার দেবীমূর্ত্তি হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া শশিশেখর উন্মত্তভাবে উঠিয়াই এক দিক লক্ষ্যে চলিলেন; ভূপেন্দ্রও তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন।

দুই দিন পরেই তাঁহারা উভয়ে ভুবনগঞ্জ আসিয়া উপস্থিত। ভূপেন্দ্র কিছু দিন পর্য্যন্ত শশিশেখরকে কত প্রবোধ দিলেন; কিন্তু তাঁহার

হৃদয়াগুন কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইল না। ভূপেন্দ্র মনে ভাবিলেন, এ অবস্থায় শশিশেখরকে একা রাখিয়া তিনি কোন মতেই যাইতে পারেন না। তিনি এ সমস্ত বিষয় পিতাকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন, এবং শশিশেখরের প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ভুবনগঞ্জ থাকাই স্থির করিলেন। ভূপেন্দ্র প্রতিদিন শশিশেখরকে সঙ্গে করিয়া বায়ু সেবন করিতে বাহির হইতেন, এবং নানা প্রকার সদুপদেশ পূর্ণ পুস্তক শ্রবণ করাইয়া, গিরিবালার চিন্তা হইতে তাঁহার মনকে পৃথক রাখিতে চেষ্টা করিতেন। অবশেষে ভূপেন্দ্রের প্রবোধ বাক্য নিতান্ত বিফল হইল না। শশিশেখর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। শশিশেখরের মানসিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া, ভূপেন্দ্র নিতান্ত সুখী হইলেন। এক দিন উভয়ে নদীতীরে সান্ধ্যভ্রমণ করিতেছেন; এমত সময় শশিশেখর নিজেই ভূপেন্দ্রকে বলিলেন "ভূপেন্দ্র, ভাই, আর কত দিন তুমি এ হতভাগার জন্য কষ্টভোগ করিবে? এ গৃহে দগ্ধ হইবার জন্য আসিয়াছিলে, তাহা হইলে।"

ভূপে। আর কি কষ্ট পাইব শশি? তোমার কষ্ট দেখিয়াই আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি শীঘ্র প্রকৃতিস্থ হও।

শশি। আমার মন এখন অনেক শান্ত হইয়াছে। আমার জন্য তুমি আর ভাবিও না। তোমার পিতা তোমাকে অল্প দিন মাত্র দেখিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ও শোক দুঃখে পূর্ণ। তোমাকে দেখিলে তাঁহার অনেক কষ্ট দূর হইবে। ভূপেন্দ্র, তবে একবার যাইয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ কর। তিনি তোমাকে দেখিয়া শান্তিলাভ করুন।

ভূপে। শশি, আমি তোমাকে এ অবস্থায় কিরূপে একা রাখিয়া যাইব?

শশি। "ভূপেন্দ্র, আমার যাহা হইবার হইয়াছে। পৃথিবীতে

আমি সুখের আশা ত্যাগ করিয়াছি। তবে দেখি, যদি এ অপদার্থ জীবন দিয়া পৃথিবীর বিন্দুমাত্রও উপকার সাধিত হয়, অন্ত পর্য্যন্ত এ জীবনকে তৎসাধনেই নিযুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিব। আরও বলি," এ হতভাগার মঙ্গল চিন্তায় গিরির হৃদয়ও দগ্ধ হইয়া গিয়াছে; তাহাকে তোমরা সান্ত্বনা না করিলে, তাহার দশা কি হইবে?' গিরিকে বলিও সে যেন আমার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া আর কষ্ট ভোগ না করে। ভাই, গিরিকে দেখিও—" এই কথা বলিয়াই শশিশেখর নীরব হইলেন।

ভূপে। "শশি, তবে তুমি আমাদের সঙ্গে কতকদিনের জন্য চল! পশ্চিমের জল বায়ু নিতান্ত স্বাস্থ্যকর, শরীরের কিছু স্বাস্থ্য বিধান হইলে পরে বাড়ী আসিও।" ভূপেন্দ্রকে ছাড়িয়া দিতে শশিশেখরের নিতান্ত কষ্ট হয়, আর অধিক দিন তাঁহাকে রাখিতেও পারেন না; একবার তাঁহাব ইচ্ছা হইল ভূপেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদের দেশে যান। মানুষের নিঃস্বার্থ দেবকার্য্য মানুষকে নিঃস্বার্থ করে। গিরিবালার দেবভাবে শশিশেখরও আপন স্বার্থ ভাব অনেকটা ভুলিতে পারিয়াছেন; তিনি ভাবিলেন বারাণসী গেলে গিরিবালার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। নিজের হৃদয়ের প্রতি বিশ্বাস নাই; আবার হয়ত উভয়ের অবস্থাই নিতান্ত বিষময় হইয়া দাঁড়াইবে। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন "আমি তোমাদের সঙ্গে এখন যাইতে পারিব না। ভাই, এ হতভাগাকে ভুলিও না; ভুলিবেই বা কেমন করিয়া? এ গৃহে থাকিয়া যে কষ্ট ভোগ করিলে, তাহা মনে করিয়াই শশিশেখরকে মনে রাখিতে পারিবে। আর এক কথা ভাই, তোমাদের বিবাহের সময় একবার সংবাদ দিও, পারিলে দেখিয়া আসিব।" হর্ষ দুঃখ এক কালে ভূপেন্দ্রের অন্তরে ক্রিয়া করিয়া উঠিল! শশিশেখরের মানসিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া, ভূপেন্দ্রের হৃদয় আহ্লাদে নাচিল; কিন্তু তাঁহার জীবনের দিকে চাহিয়া, তাঁহার হৃদয় বিষাদ সলিলের

অতল তলে নিমগ্ন হইল। তিনি হৃদয়ের বেগে শশিশেখরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "ভাই শশি, আর কবে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে? তোমার অপরিসীম স্নেহের প্রতিদান কিছুই করিতে পারিলাম না" এই বলিয়া ভূপেন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। শশিশেখরেরও চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল।

অবশেষে ভূপেন্দ্রের যাওয়ার দিন স্থির হইল। অনেক দিন একত্র অবস্থানের পর চক্ষুজলে বন্ধুদ্বয় উভয়ের নিকট উভয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শশিশেখর হেমপ্রভাকে বলিলেন "ভগ্নি! কষ্ট ভোগ করিবার জন্যই দৈব দুর্ব্বিপাকের পর বিধাতা আপনাকে এ গৃহে আনিয়াছিলেন; তাহা যথেষ্ট ভোগ করিলেন। আমি আপনাকে আর কি বলিব! গিরিবালাকে দেখিবেন।" কোমল হৃদয়া হেমপ্রভা কিছু বলিতে পারিল না একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। পরে ভূপেন্দ্র হেমপ্রভাকে লইয়া দেশে রওনা হইলেন!

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:—:০:—:—

পিতৃহীনা।

অজিৎ সিংহ গিরিবালাকে লইয়া বারাণসী আসিয়া পৌঁছিলেন। জন কোলাহল সমাকুল লোকালয় অপেক্ষা নির্জ্জন প্রদেশই এখন তাঁহার নিকট অধিক শান্তিকর, তিনি বারাণসীর কোন নিভৃত স্থানে আপনার আবাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া, অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাসস্থানের

অনতিদূরেই শঙ্কর-শিরস্থশোভিনী শীতল-সলিলা জাহ্নবী কাশীতল বাহিয়া কুল্ কুল্ রবে বারাণসীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া প্রবাহিতা। জাহ্নবীতীরে প্রস্তর গ্রথিত হর্ম্ম্যরাজী দাঁড়াইয়া, মস্তকোত্তলনে যেন অপর পাড়ের শোভা সন্দর্শন করিতেছে। সারি সারি তরণী রাজীতে ভাগীরথী বক্ষ ভরিয়া আছে। অজিতের বাসস্থানের অপর প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র প্রান্তর ; প্রান্তর ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ ; হরিতবর্ণ দুর্ব্বাদল ক্ষেত্র বৃক্ষতল শোভিত করিয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে পক্ষিরব ভিন্ন সেখানে অন্য কোন শব্দ প্রায় শুনা যাইত না। অজিতের নিকট বিশেষতঃ গিরিবালার নিকট এ স্থান কিঞ্চিৎ শান্তিকর বোধ হইল।

কিছু দিন পর ভূপেন্দ্র হেমপ্রভাকে লইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। কোমল হৃদয়া হেমপ্রভা গিরিকে দেখিয়াই কাঁদিয়া পড়িল। গিরির চক্ষেও জল আসিয়াছিল কিন্তু সে তাহা আপনিই সম্বরণ করিয়া লইল। এইরূপে কিছু দিন চলিয়া গেলে পর, এক দিন গিরিবালা ও হেমপ্রভা বসিয়া আলাপ করিতেছিল। গিরিবালার নিতান্ত ইচ্ছা শশিশেখরের সংবাদ হেমপ্রভাকে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করিলে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। গিরিবালা কত বার চেষ্টা করিল, তবু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অবশেষে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হেমপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাও।" "আসিব এখন" এই বলিয়া গিরি তথা হইতে চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই আবার আসিয়া হেমপ্রভার নিকট বসিল। এবার গিরি বসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল "হেম, শশিশেখর কেমন আছে?" জিজ্ঞাসা করিয়া পুনরায় নীরব হইল। সরল স্বভাবা হেমপ্রভা বলিল "ভগ্নী, সে কথা কেন আর জিজ্ঞাসা কর? শশিশেখর এখন আর সে শশিশেখর নাই। তাঁহার দেব কান্তি শুকাইয়া, অস্থি চর্ম্ম সার হইয়াছে। আহার, নিদ্রা

শশিশেখরের নিকট হইতে এক প্রকার বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সেত এখন এক প্রকার উন্মাদ।” লক্ষ লক্ষ বিষাক্ত তীক্ষ্ণ শর যেন গিরিবালার হৃদয়ে যুগপৎ বিদ্ধ হইল। আবার হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া, পরক্ষণেই বলিল “শশিশেখরের পিতা তাঁহার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন না?”

হেম। “তিনি পুত্রের বিবাহের জন্য কত চেষ্টা পাইতেছেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। শশিশেখর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—এ জীবনে আর কাহাকে বিবাহ করিবেন না”। গিরিবালা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলনা, নীরবেই বসিয়া রহিল।

গিরিবালা ও হেমপ্রভা যে প্রকোষ্ঠে বসিয়া, কথোপকথন করিতেছিল তাহার সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে অজিৎ সিংহ হস্তোপরি গণ্ড রাখিয়া অবনত মস্তকে বসিয়া আছেন। ভূপেন্দ্র আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং পিতাকে বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বলিলেন “ভারত একবারে রত্ন শূন্য হইতেছে। বিধাতা ইংরাজের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; ভারতের আশাদীপ একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। বন্ধুবর তান্তিয়া টোপীর প্রাণদণ্ড হইয়াছে।”

ভূপে। “কি বলিলেন! তান্তিয়া টোপীর প্রাণদণ্ড হইয়াছে?” অন্য প্রকোষ্ঠ হইতে হেমপ্রভা একথা শুনিল; অমনি “বাবা, আপনিও আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন?” এই কথা বলিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। অজিৎ, ভূপেন্দ্র আসিয়া সে প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। গিরিবালা আপনার কষ্ট ভুলিয়া, শশিশেখরের চিন্তা ছাড়িয়া, একেবারে হেমপ্রভাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং সান্ত্বনা বাক্যে অঞ্চল দ্বারা তাহার চক্ষুজল মুছাইয়া বলিল “হেম, তুমি ক্ষত্রিয় বালিকা, তোমার পিতা ধর্ম্ম, দেশ রক্ষার্থে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন; ধর্ম্ম তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছে, তাঁহার জন্য কাঁদিও না।”

হেম। "এতদিনে বিধাতা আমার পিতৃগৃহ শ্মশান তুল্য করিলেন। কাকা সেই নিষ্ঠুরদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন; বাবাও উহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিলেন না।" এই বলিয়া গিরিবালার বক্ষে মস্তক রাখিয়া, চক্ষুজলে তাহার বক্ষ ভাসাইতে লাগিল। গিরিবালা হেমপ্রভাকে সান্ত্বনা করিতে না পারিয়া, কতক্ষণ তাহাকে কোলে করিয়াই বসিয়া রহিল; পরে তাহাকে হস্তে ধরিয়া অন্য স্থানে লইয়া গেল।

যে সময় ভারতের সমস্ত আশানলের সহিত সিপাহী বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইয়া গেল; যে সময় ভারত একেবারে অসহায় হইয়া, ইংরাজ হস্তে সম্পূর্ণ রূপে আত্ম সমর্পণ করিল; যে সময় ভারতবাসী বুঝিল অনন্তকাল ব্যাপিয়া তাহাদিগকে পর পদপীড়নে পীড়িত হইতে হইবে; তাহার পর হইতেই ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী রূপে ভারত বিজেতৃ বণিক সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে সুবিশাল ভারত রাজ্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। সেই হইতেই আমরা ইংরাজ পদে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিয়া, ইংরাজগত প্রাণ হইলাম। হায়! এদিকে ভারতের অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়-বীর্য্য সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হইল; অমনি ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্য গ্রহণ ঘোষণা-ভেরী স্বর্গ মর্ত্ত্য নিনাদিত করিয়া, সমস্ত ভারত রাজ্যে বাজিয়া উঠিল। আসন্ন মৃত্যু অশিতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ হইতে দুগ্ধাহারীঅপগণ্ড শিশু পর্য্যন্ত ভারতের প্রত্যেক মানব অদৃষ্টে, প্রত্যেক কীট হইতে কীটাণুর অদৃষ্টে বিধাতা এই চির দাসত্ব লিপি অতি স্পষ্টাক্ষরে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিলেন। বিজেতৃবৃন্দকে অপ্রতিহত রূপে পান করাইবার জন্য ভারত তাহার সর্ব্বাঙ্গের শীতল শোণিত বাহির করিয়া দিল।

ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারত রাজ্য গ্রহণের পর যে ঘোষণা পত্র বাহির হয়; তাহাতে প্রচারিত হইল যে, "সিপাহী বিদ্রোহে যে সমস্ত লোক কোন গুরুতর অপরাধ করে নাই, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রতি কোন দণ্ড

বিধান করিবেন না।" ভূপেন্দ্র পূর্ব্ব বঙ্গে থাকিয়া এ সংবাদ জানিতে পারেন নাই। এখন বারাণসী আসিয়া, এ সংবাদ শ্রবণে পুনরায় মাতৃ ভূমি অযোধ্যা গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। অজিৎ সিংহ অযোধ্যাতে যাইতে চাহিলেন না; তিনি গিরিবালাকে লইয়া লুমাতে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভূপেন্দ্র হেমপ্রভাকে লইয়া অযোধ্যায় চলিয়া গেলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মিলন ও বিচ্ছেদ।

পিতৃশোক হেমপ্রভার কোমল অন্তঃকরণকে অধিক দিন ব্যাপিয়া দগ্ধ করিল। ভূপেন্দ্র তাহাকে এ চিন্তা হইতে বিরত রাখিতে অত্যন্ত প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু হেমপ্রভা মানস নেত্রে যখনই পিতৃগৃহের প্রতি চাহিয়া দেখিত, তখনই পরিজন বর্গের অসম্ভব মৃত্যুর বিষয় ভাবিয়া সে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িত। জগৎ সৃষ্টিতে সুখ দুঃখ কিছুই সমভাবে অবস্থান করিতে পারে না। বেলা বর্দ্ধিত সাগর সলিলের ন্যায় অনবরত উহার হ্রাস বৃদ্ধি পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিধাতা যদি বিস্মৃতিরূপ মানবীয় মানসিক পরিবর্ত্তন জগৎ শরীরে সৃষ্টি না করিতেন; তাহা হইলে প্রিয়বিরহ জনিত শোকার্ত্তের, দুরবস্থা পীড়িত দীনের, এবং শত শত ভগ্নহৃদয়ের হাহাকারে সমস্ত পৃথিবী অবিশ্রান্ত নিনাদিত হইত; নয়নাসার পৃথিবীকে পঙ্কিল করিয়া তুলিত। সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ

করিয়াও একটী প্রকৃত সুখী মিলিত কি না সন্দেহ। এ বিস্মৃতি বলেই প্রাণাধিক-প্রিয়তম-পুত্রশোকাতুরা-জননী সেই প্রিয়তমের শোক ভুলিয়া, আবার সংসারে অসারখেলা খেলিতেছেন। যে বিস্মৃতি বলে ভুবনৈক-বন্ধুপ্রিয়পতিবিরহবিধুরা কোমলহৃদয়াপ্রণয়িণী হৃদয় হইতে শেল তুলিয়া ফেলিয়া, যে মূর্ত্তি দেখিলে সংসারে থাকিয়া আর কিছু চাহিত না,তাহা ভুলিয়া আবার বাঁচিয়া রহিয়াছে ; যে বিস্মৃতি বলে যুবক হৃদয় হইতে হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন হারাইয়া, অনন্ত জীবনে তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়াও শূন্যহৃদয়ে আবার জগতে একজন হইয়া রহিয়াছে ; পর্ণকুটীর শায়ী ভিক্ষান্নভোজী সম্পন্ন হইয়া, যাহার বলে মনে করে আজন্ম তাহার এরূপ অবস্থা চলিয়া আসিয়াছে, আজন্ম সে বড়লোক ; হর্ম্ম্যবাসী গর্ব্বিতধনী দিনান্তে একসন্ধ্যা আহার করিয়া, যাহার বলে ঐশ্বর্য্য মত্ততা ভুলিয়া, শ্রেষ্ঠবিষয়ভোগী ইন্দ্রিয়গণকে অতি সামান্য বিষয় ভোগেও চরিতার্থ করিতে সক্ষম হয় ; সেই বিস্মৃতির মায়ামন্ত্রবলে পিতৃশোক, পরিজনবর্গের শোক হেমপ্রভার মনে হীনবল হইয়া আসিল। এতদিন সংসার কাননে যে স্বর্ণলতা ভূপেন্দ্রকে বেষ্টন করিবার জন্য দুলিতেছিল, সেই হৃদয় বন্ধনের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। অজিৎ সিংহ গিরিবালাকে লইয়া অযোধ্যাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুদিন পরে ভূপেন্দ্রের বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইল। গিরিবালা শুনিয়া বড় সুখী হইল ; সে তাহার দাদার সুখ প্রতিমাখানি সাজাইতে লাগিল।

বিবাহের কিছু দিনপূর্ব্বে ভূপেন্দ্র শশিশেখরকে পত্র লিখিলেন। শশিশেখর যথাসময়ে তাঁহার পত্র পাইলেন ; পত্র পাইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন অযোধ্যাতে আসিলে, যে বহ্নি কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত হইয়াছে, তাহা আবার জ্বলিয়া উঠিবে। গিরিবালার সহিত সাক্ষাৎ হইলে উভয়ের হৃদয়ই আবার

ফাটিয়া যাইবে; ভূপেন্দ্রের সুখের কার্য্যে দুঃখ মিশ্রিত হইবে। আবার তিনি মনে মনে বলিলেন "এ দগ্ধ হৃদয় আর কি দগ্ধ হইবে, না হয় উহার ভস্মাবশেষও একেবারে শেষ হইয়া যাইবে।" ভূপেন্দ্রের বিবাহে না আসিলে তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইবেন। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শশিশেখর স্থির করিলেন এ কার্য্যে আসাই কর্ত্তব্য। শশিশেখরও এখন মনকে একপ্রকার প্রবোধ দিয়াছেন। তিনি মনে ভাবিলেন অযোধ্যাতে আসিয়া, গিরিবালার সহিত পুনরায় যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, তৎজ্জন্য সতর্ক থাকিবেন। তিনি ভূপেন্দ্রকে আপনার সম্মতি লিখিয়া পাঠাইলেন; ভূপেন্দ্র শুনিয়া বড় সুখী হইলেন।

ভূপেন্দ্রের বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। শশিশেখর আসিয়া যথাসময়ে অযোধ্যায় পৌছিলেন। আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রিত হইল; অবশেষে যথাসময়ে মহা সমারোহে ভূপেন্দ্রের সহিত হেমপ্রভার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের অনতি পরেই শশিশেখর বাড়ী যাইতে চাহিলেন; কিন্তু ভূপেন্দ্রের অনুরোধে তাঁহাকে কতক দিনের জন্য অযোধ্যায় অবস্থান করিতে হইল।

গিরিবালাও স্থির করিয়াছিল শশিশেখরের সহিত আর দেখা করিবে না। সে শশিশেখরের দৃষ্টি হইতে দূরে থাকিতে বিশেষ যত্ন পাইল। একদিন গিরিবালা শশিশেখরকে দেখিতে পাইল। তাঁহার অবস্থা দর্শনে গিরির নয়নস্রোত আবার গণ্ড বাহিয়া বহিল। গিরি একটী নির্জ্জন স্থানে বসিয়া এ সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিল। মনে মনে বলিল "বিধাতার সৃষ্টিতে কেন এ কঠোর পরিণাম মনুষ্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? লোকের আশা কেন পূর্ণ হয় না? না হইলে এক দিনেই কেন সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা শেষ হইয়া যায় না?" শশিশেখরের অবস্থা মনে করিয়া ভাবিতে লাগিল "আমার একার্য্যের পরিণাম কি হইল?" গিরিবালার

ন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। আবার একটু নীরবে থাকিয়া নিজেই
লিল "না, না, তা কখনই হইবে না।" নির্জ্জন প্রদেশে চিন্তাতরঙ্গে
রিবালা আবার ভাসিতে লাগিল। কতক্ষণ এরূপ ভাবে বসিয়া আছে;
াং পশ্চাতে মনুষ্য পদশব্দ শুনিতে পাইল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে
শিশেখর; অমনি চঞ্চল ভাবে উঠিয়া দাড়াইল। গিরির হৃদয় কাঁপিয়া
ঠিল। মনুষ্য শোণিতহারী ভীষণ হিংস্র পশু দর্শনে মনুষ্যের হৃদয় যেরূপ
াপে; স্বপ্নের বিভীষিকা দর্শনে,নরহত্যাকারী অপরাধীর বধ্যভূমি দর্শনে
দয় যেরূপ কাঁপে; এ হৃদয় কম্পন সেরূপ নয়। ইহার কারণ ও ক্রিয়া
কবল গিরিবালাই বুঝিতে পারিল; অন্যের বুঝিবার ক্ষমতা নাই।
শিশেখরকে দেখিয়া তাহার অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, মজ্জা সমুদয় কাঁপিয়া
ঠিল। রক্তাধার হইতে শোণিত স্রোত তীব্র গতিতে ধমনীপথে সমুদয়
হ ব্যাপিয়া ছুটিল। গিরি নীরবে দাড়াইয়া রহিল। শশিশেখর পৃথিবীর
খে জলাঞ্জলি দিয়া, অতি কষ্টে হৃদয়ের আগুন হৃদয়ে সংযত করিয়া,
সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন; তাহা এখন কোথায় রহিল? গিরি-
লাকে দেখিয়া তিনি আবার উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। উন্মত্তভাবে
তক্ষণ গিরির মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া, হৃদয়পীড়িতস্বরে
লিলেন "গিরিবালা,"—আর বলিতে পারিলেন না, পূর্ব্ববৎ দাড়াইয়া
হিলেন। গিরিবালাও আর নীরবে থাকিতে পারিল না; আবার সেই
কামল, সেই স্নেহব্যঞ্জক, সেই সুধাবর্ষী সান্ত্বনা বাক্যে শশিশেখরকে
লিল "শশি, আর কেন? আর কেন গত কথা স্মরণ করিয়া কষ্ট
াও? বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে; এখন আর এ সমস্ত মনে স্থান দিও
।" একটু থামিয়া আবার বলিল "শশি, এ জীবনে আমার আর
ান আশা নাই, তুমি বিবাহ কর. আমি এ কথা শুনিয়া সুখী হই।

শশি। "সে অনন্ত শয্যায় শয়ন না করিয়া আর কাহাকে বিবাহ

করিব না। গিরিবালা যাই, এ জীবন্ আর অধিক দিন দেহে রাখিতে পারিব না। তোমার নিকট এক ভিক্ষা, যখন এ অপদার্থ জীবন এ অপদার্থ দেহ ছাড়িয়া যাইতে চেষ্টা করিবে; তখন, গিরিবালা, তখন সেই চিরনির্ব্বাণের সময় একবার এ হতভাগাকে দেখা দিও। ঐ শান্তি পূর্ণ স্বর্গীয় পবিত্র মুখখানি দেখিতে দেখিতে শশিশেখর প্রাণত্যাগ করিবে।" শশিশেখরের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল; আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তাহার দাঁড়ান অসম্ভব বোধ হইল, অমনি দ্রুতপদে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত গিরি নয়নস্রোতকে অতি কষ্টে সম্বরণ করিয়া রাখিয়া ছিল, এখন আর পারিল না; বরিষার বারি ধারার ন্যায় চক্ষুজলে বুক মুখ ভাসিতে লাগিল। গিরি কতক্ষণ নীরবে থাকিয়া হৃদয়ের বেগে গাহিতে লাগিল।

কেমনে বহিব বল এ জীবন ভার?
সংসারের কিছুইত নহেরে আমার॥
যে বিমল শশী হাসিলে হৃদয় হাসেরে,
বিষাদ মেঘেতে তাহা হয়েছে আঁধার॥
যার সুখ বিনা চিত কিছু নাহি চায়রে,
কেমনে এ দশা হায়! নেহারি তাহার?
এ জীবন গেলে শশিহে! ভুল এ দাসীরে,
অনন্ত জীবনে দাসী হইব তোমার॥

গান ক্ষান্ত করিয়া গিরি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "হিন্দুসমাজ! আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়া ছিলাম? আমার জন্য কেন এ পরিণাম ব্যবস্থা করিলে?" গিরি তথা হইতে চলিয়া গেল।

সমাপ্ত